

বাংলার শহীদ

বাংলার শহীদ

মহারাজ নন্দকুমার, মহাকবি মাইকেল, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র,
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

দাম ঃ এক টাকা মাত্র

[তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর
উপ-পাঠ্য রূপে লিখিত]

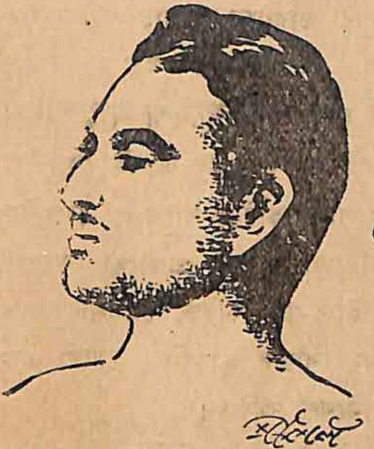
শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক কর্ত্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায় কর্ত্তৃক শ্রীকালী প্রেস ৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

শহীদ-স্মরণে

বাংলার সেরা সন্তান যারা
করিয়া আত্মদান —
অমর-মরণ বরণে দিয়াছে
মুক্তির সন্ধান, —
কালোর মাঝারে আলোর দিশারী,
চির-নির্ভীক, বীর, —
তাদের স্মরণে, তাদের চরণে
নত করি এসো শির।

সূচী

শহীদ প্রফুল্ল চাকী



আজ আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, ইংরেজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ইংরেজকে ভারত ছাড়াইবার আন্দোলন আরম্ভ হয় প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, সিপাহী বিদ্রোহের সূচনায়; ইংরেজ পাশবিক বল প্রয়োগে সে বিদ্রোহ দমন করে। ইহার পর প্রায় ৫০ বৎসর ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন এক প্রকার স্তিমিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এই আন্দোলন পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই আন্দোলনের প্রধান হোতা ছিল বাঙ্গালী। বাঙ্গালীই এই স্বাধীনতা আন্দোলন প্রজ্বলিত করে এবং তাহাদের চেষ্টাতেই ইহা সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ কয়েকজন নেতার প্রচেষ্টায় বাংলায় বৈপ্লবিক-সমিতি স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, তাহার পূর্ব্বেও কয়েকবার বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নানা কারণে ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যে বৈপ্লবিক

সমিতি স্থাপিত হয়, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু তরুণ যুবক তাহাতে যোগদান করিয়া ইংরেজকে ভারত-ছাড়া করিবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়। এই সম্পর্কে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই **স্বদেশী আন্দোলন** নামে খ্যাতিলাভ করে। এই আন্দোলনের ফলেই বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতিগুলি দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির সভ্যেরা একদিকে যেমন প্রকাশ্যে স্বদেশী আন্দোলনের গতিবেগ বাড়াইতে চেষ্টা করিত, তেমনই অপর দিকে অত্যন্ত গোপনে বোমা, বারুদ প্রভৃতি তৈয়ারী এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করায় মনোনিবেশ করিত।

প্রফুল্ল চাকী এই সময় এই গুপ্ত-সমিতিতে যোগদান করেন এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন,—"ক্ষুদিরাম কিন্তু প্রথম শহীদ নয়, প্রথম শহীদ তাঁহার সহকর্ম্মী প্রফুল্ল চাকী। সেই আমার মুরারিপুকুর বোমার বাগানের স্বহস্ত দীক্ষিত ছেলে; ক্ষুদিরাম ছিল আমার মেদিনীপুর শাখার কর্ম্মী, সত্যেন বসুর নির্ব্বাচিত মৃত্যুদীক্ষায় দীক্ষিত সন্তান। আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী চক্রের তিনজন নেতার আদেশে এই নির্ভীক ছেলেরা মজঃফরপুরে যাত্রা

করে জজ কিংস্‌ফোর্ডকে বধ করিবার জন্য, আমিই তাহাদের হাতে অস্ত্র দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া এই কার্য্যে যাত্রা করাই।"

প্রফুল্ল চাকী রংপুর জেলা-স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার শৈশব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার বাড়ী রংপুরে ছিল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলেন তাঁহার বাড়ী ছিল বগুড়ায়। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, তিনি উত্তর বঙ্গের একজন বিশিষ্ট কায়স্থ সন্তান। কলিকাতার গুপ্ত-সমিতির সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি রংপুরের গুপ্ত-সমিতির একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তথাকার স্বদেশী আন্দোলনে তিনি ছিলেন ছাত্র-সমাজের একজন নেতা। ১৯০৬ সালের মধ্যভাগে পূর্ব্ব-বঙ্গের অত্যাচারী লেপটেনাণ্ট গভর্ণর ফুলার সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টায় যখন বারীন্দ্রকুমার জনৈক সহকর্ম্মীর সহিত রংপুরে যান সেই সময়ে প্রফুল্লের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি প্রফুল্লকুমারের একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হন। তখন প্রফুল্লের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর হইবে।

স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে রংপুর জেলা-স্কুল হইতে প্রফুল্লকুমারের নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। বারীন্দ্র কুমারের সহিত পরিচিত হওয়ার পরেই প্রফুল্লকুমার কলিকাতায় আনীত হন এবং তিনি কলিকাতার বৈপ্লবিক-সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপে গৃহীত হন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস

পর্য্যন্ত প্রফুল্ল বাংলাদেশের অধিকাংশ বৈপ্লবিক কর্ম্ম-তৎপরতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালের মধ্যভাগে রংপুরে বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী ডাকাতির প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ডাকাতি অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই। রংপুরে যে ফুলার সাহেবের গাড়ী উল্টাইয়া তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়, তাহাতেও প্রফুল্ল চাকী ছিলেন অন্যতম সহকর্ম্মী। কিন্তু ফুলার সাহেব তখন আসাম হইতে রংপুরে না আসিয়া ষ্টীমার যোগে গোয়ালন্দে চলিয়া যান। রংপুরের গুপ্ত-সমিতির নিকট এই সংবাদ পৌছিলে বারীন্দ্র কুমারের আদেশে প্রফুল্ল চাকী অপর একজন কর্ম্মীর সহিত ছুটিলেন গোয়ালন্দে। সেখানে যাইয়া তাঁহারা দেখিলেন, ফুলার সাহেব পূর্ব্বেই স্পেশাল ট্রেনে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই ফুলার হত্যার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া গেল।

ইহার পর কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতি এবং বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণার স্যার এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টার সহিতও প্রফুল্ল চাকী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯০৭ সালের বর্ষাকালে প্রফুল্লকে বাঁকুড়ায় পাঠান হইয়াছিল একটি ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু এই ডাকাতি ব্যর্থ হইয়াছিল। মেদিনীপুরের কাঁথি রোডে একটি ডাকাতির জন্যও প্রফুল্ল চাকী প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রফুল্ল নিতান্ত অল্পবয়স্ক হইলেও তিনি গুপ্ত-সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের বিশেষ আস্থা ও প্রীতি

অর্জ্জন করিয়াছিলেন, নতুবা এরূপ গুরুতর কার্য্যের জন্য ঐরূপ একজন তরুণবয়স্ক ব্যক্তি প্রেরিত হইতেন না। মজঃফরপুরে মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করিতে যাওয়ার পূর্ব্বেও প্রফুল্ল চাকী একাধিক গুপ্ত-হত্যার চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৯০৭ সালের শেষ ভাগে এবং ১৯০৮ সালের প্রথম দিকে বিপ্লবীদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছিল বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর; তিনি লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গবিভাগের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করিতে পর পর তিনবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিন বারই তিনি রক্ষা পান। প্রথম বারের হত্যা চেষ্টার সঙ্গে প্রফুল্লের কোনও সংস্রব ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের হত্যা-চেষ্টার সঙ্গে প্রফুল্ল ছিলেন বিশেষভাবে জড়িত। দ্বিতীয়বার স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় চন্দননগর ও মানকুণ্ডু ষ্টেশনের মধ্যে। এইবার রেল লাইনে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বোমা রাখা হইয়াছিল, কিন্তু পরে জানা গেল যে, লাট সাহেবের স্পেশাল গাড়ী ঐ পথে আসিবে না। তৃতীয় বারের চেষ্টা হইয়াছিল মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে। এই প্রচেষ্টায় প্রফুল্ল কুমার বারীন্দ্র ঘোষের সহকারীরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। এইবারে বোমা ফাটিয়াছিল এবং লাট সাহেবের গাড়ীর ইঞ্জিন এবং রেল লাইনেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু লাট সাহেব প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের উপর বিপ্লবীদিগের ভয়ঙ্কর জাতক্রোধ ছিল। কারণ তিনি ভয়ঙ্কর বিপ্লববিরোধী ছিলেন এবং বিচারে বিপ্লবীদিগের উপর অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। কলিকাতায় একবার তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করা হইয়াছিল। পরে তাঁহাকে মজঃফরপুরে বদলী করা হয়। বিপ্লবিগণ সেখানেও তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করেন।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতার বিপ্লবী-চক্রের বৈঠকে স্থির হয় যে, মজঃফরপুরে মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করিতে হইবে। প্রফুল্ল চাকী ইতিপূর্ব্বে বহু হত্যা-প্রচেষ্টায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই কার্য্যে তাঁহাকেই মনোনীত করা হয়। কিন্তু এইরূপ গুরুতর ব্যাপারে তাঁহাকে একাকী পাঠানো যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া তাঁহার সহিত অপর কাহাকেও পাঠান সঙ্গত বলিয়া স্থির হয়। বহু আলোচনার পর সাব্যস্ত হয় যে, মেদিনীপুর গুপ্ত-সমিতির সভ্য ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রিয় শিষ্য ক্ষুদিরাম বসুকে তাঁহার সহিত পাঠান হইবে। তাই মেদিনীপুর হইতে ক্ষুদিরামকে কলিকাতায় আনা হইল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের উপর কিংস্‌ফোর্ডের হত্যার ভার দিয়া তাঁহাদিগকে মজঃফরপুরে পাঠান হইল। তাঁহাদের দুই জনকে দেওয়া হইল দুইটি রিভলভার এবং কিংস্‌ফোর্ড হত্যার জন্য তৈয়ারী বোমা।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামে পূর্ব্বের কোনও পরিচয় ছিল না। এই হত্যা ব্যাপারে যখন পরিচয় হয় তখন ক্ষুদিরাম প্রফুল্লকে

জানিলেন দীনেশ নামে। মজঃফরপুরে যাত্রার সময় ক্ষুদিরাম ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন,—দুর্গাদাস সেন।

মজঃফরপুরে যাইয়া তাঁহারা উভয়ে এক ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলেন। ইহা ঘটিয়াছিল ১৯০৮ সালের মার্চ্চমাসের শেষ তারিখে। কিংস্‌ফোর্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য তাহাদিগকে কয়েকদিন সেখানে কাটাইতে হইয়াছিল। এই সময় মুরারিপুকুর বাগানে 'সুকুদাদার' নামে দীনেশ রায়, ওরফে প্রফুল্ল চাকী একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন—"প্রিয় সুকুদাদা, আমরা নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। পথে দুর্গাদাসের পকেট হইতে সমস্ত টাকা হারাইয়া গিয়াছে।...আমি এখনও বরকে দেখিতে পাই নাই,—কিন্তু বরের বাড়ীখানা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। বরের বাড়ীখানি খারাপ নয়। আমি আপনাকে সবই জানাইব। দয়া করিয়া নিম্নলিখিত নামে টাকা পাঠাইবেন।"

প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে থাকার সময় প্রত্যহ কিংস্‌ফোর্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কিংস্‌ফোর্ড প্রত্যহ প্রায় রাত্রি ৮ টার সময় ক্লাব হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া নিজের বাংলায় ফিরিয়া আসেন। তাই তাঁহারা এই সময়েই একদিন তাঁহার উপর বোমা ফেলিবেন বলিয়া স্থির করেন। ঠিক হইয়াছিল ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় কার্য্য সমাধা করা হইবে। এই কল্পনা অনুযায়ী ক্ষুদিরাম গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা ছুড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেদিন গাড়ীতে কিংস্‌ফোর্ড

ছিলেন না, ছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ কেনেডীর পত্নী মিসেস্ কেনেডী ও কন্যা মিস্ কেনেডী। বোমার আঘাতে তাঁহারা উভয়েই নিহত হইলেন। বোমা ছুড়িবার পর প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম উভয়ে পরস্পরের বিপরীত দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল চাকী একখানি রেলগাড়ীতে চড়িয়া মোকামা ঘাটের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহাকে দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায় গোয়েন্দা পুলিশের সাব্-ইন্স্পেক্টার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন। মোকামা ঘাটে গাড়ী পৌছিলে প্রফুল্ল দেখিতে পাইলেন যে, পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে প্রস্তুত। পুলিশের হাতে ধরা পড়া অপেক্ষা আত্মহত্যা করাই প্রফুল্ল সমীচীন মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়া পুলিশের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৯০৮ সালের ১লা মে তারিখে।

যে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফুল্লকে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে বিপ্লবিগণ ক্ষমা করেন নাই। তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন।

এইরূপে স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রথম শহীদ হইলেন প্রফুল্ল চাকী। বাঙ্গালীর জাতীয়-ইতিহাসে প্রফুল্ল হইয়া থাকিবেন চির অমর। চিরদিন বাঙ্গালী তাঁহার পবিত্র অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করিবে।

প্রফুল্ল চাকী স্মরণে

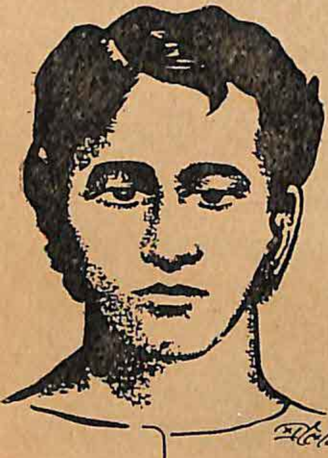
(গান)

প্রফুল্ল তুমি প্রথম শহীদ নীরব কর্ম্মবীর—
তব বিপ্লব-প্রয়াসে ঘুচিল নিদ্রা শতাব্দীর।
ভয়ে ভীত যত শাসকের দল
ভাবী দিন ভেবে হল চঞ্চল—
বোমা বন্দুকে কাঁপিল গঙ্গা, কাঁপে গণ্ডকতীর।

এ নয় স্বপ্ন, এ নয় কাহিনী, তোমার আত্মদান
মুমূর্ষু দেশে আনিল জোয়ার, আনিল নূতন প্রাণ।
দেখ চেয়ে আজ তোমার স্বদেশে—
আসিল স্বরাজ অভিনব বেশে—
দেশবাসী তবু তোমারে স্মরিয়া বেদনায় অস্থির।

—গোপাল ভৌমিক

শহীদ ক্ষুদিরাম



বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বিতীয় শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। কিংস্‌ফোর্ড হত্যা-প্রচেষ্টায় ইনি ছিলেন প্রফুল্ল চাকীর সহযোগী। বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচেষ্টায় যাঁহারা রাজরোষে পতিত হইয়া ফাঁসীর মঞ্চে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, ক্ষুদিরাম তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম।

বিপ্লব-যুগের অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম ছিলেন মেদিনীপুরের সন্তান। বাংলার জাতীয়-ইতিহাসে মেদিনীপুর একটি গৌরবময় বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম হইতে যত আন্দোলন হইয়াছে, মেদিনীপুর ছিল তাহাদের পুরোভাগে। বিগত ১৯৪২ সালে ভারতব্যাপী যে আগষ্ট আন্দোলন হয়, তাহাতে মেদিনীপুরবাসীরা যে গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার তুলনা মিলে না। ক্ষুদিরাম জন্মিয়াছিলেন স্বাধীনতার লীলাভূমি এই মেদিনীপুরে।

বাংলা সন ১২৯৬ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইংরেজী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ৫ ঘটিকার

সময় ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর সহরের হবিবপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। ত্রৈলোক্যনাথ স্থানীয় নাড়াজোল রাজের শহর তহশীলদার ছিলেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর মনে শান্তি ছিল না; কারণ, তাঁহাদের পুত্র-সন্তান হইয়া জীবিত থাকিত না। অপরূপা দেবী তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সরোজিনী দেবী মধ্যমা এবং ননীবালা ছিলেন কনিষ্ঠা। অপরূপা দেবীর পর ত্রৈলোক্যনাথের দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রথমটি সূতিকাগারে এবং দ্বিতীয়টি ছয় বৎসর বয়ঃক্রম-কালে মারা যায়। ক্ষুদিরাম মাতাপিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান।

ক্ষুদিরামের পূর্ব্বে তাঁহার দুইটি ভাই মারা গিয়াছিল বলিয়া মেদিনীপুরের গ্রাম্য প্রথানুসারে ক্ষুদিরামকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অপরূপা দেবীর নিকট তিন মুষ্টি ক্ষুদে বিক্রয় করা হয়। এইরূপ করার অর্থ এই যে, সেই দিন হইতে জননী তাঁহার সন্তানের উপর স্বত্ব পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষুদ দিয়া বিক্রয় করা হইয়াছিল বলিয়া শিশুর নাম রাখা হয়—ক্ষুদিরাম।

ছয় বৎসর বয়সের সময় ক্ষুদিরামের মাতৃবিয়োগ হয়, ইহার কয়েকমাস পরে ত্রৈলোক্যবাবুও পরলোকগমন করেন। এই সময় ক্ষুদিরামের দুই ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, এক ভগিনী ছিলেন অবিবাহিতা। পিতৃমাতৃহীন ক্ষুদিরাম ভগিনী ননীবালাকে লইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী অপরূপা দেবীর

গৃহে হাটগেছ্যা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপরূপা দেবী কনিষ্ঠ ভাই-বোন দুইটিকে জননীর ন্যায় স্নেহে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্ষুদিরামের চেহারা ছিল টুক্টুকে ফরসা, ছিপছিপে গড়ন, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। তাঁহার চেহারার মধ্যে এমন একটা ভাব ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত।

কিছুদিন পরেই ক্ষুদিরামের ভগিনীপতি তমলুকে বদলী হন; সুতরাং, ক্ষুদিরামকে আনিয়া তমলুক হাইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। শৈশবে ক্ষুদিরাম ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত ও চঞ্চল; পড়াশুনায় তাঁহার মনোযোগ ছিল না, পড়াশুনা অপেক্ষা ক্রীড়াতেই তিনি বেশী অনুরক্ত ছিলেন। পড়াশুনায় অমনোযোগিতার জন্য তাঁহাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং তিরস্কারও কম সহ্য করিতে হইত না, কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ কিছুই হইত না।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদিরামের ভগিনীপতি মেদিনীপুরে বদলি হইয়া আসেন। তখন ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এইখানেই ক্ষুদিরামের বৈপ্লবিক জীবনের সূচনা। এই সময় তাঁহার বয়স হইবে প্রায় ১৫ বৎসর। কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ক্ষুদিরামের প্রাণে প্রবল আকর্ষণ জন্মে ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য। তিনি প্যারালাল বারে খুব সাফল্য লাভ করেন এবং ভাল কুস্তিও করিতে পারিতেন।

ক্ষুদিরাম যখন অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন তখনই সমগ্র

বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সেই বন্যার স্রোত যাইয়া মেদিনীপুরেও আঘাত করে। ক্ষুদিরাম সেই আন্দোলনে মত্ত হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

ইহার পূর্ব্বেই কলিকাতায় বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং মেদিনীপুরে তাহার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। বহু ছাত্র এই সমিতিতে যোগদান করেন। ক্ষুদিরাম ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। সেই সময় মেদিনীপুরের বিপ্লবী যুবক-নায়কদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ইনি পরে মাণিকতলা বোমার মামলায় ধরা পড়িয়াছিলেন এবং এই মোকদ্দমার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেলের মধ্যেই রিভলবারের গুলিতে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসীর মঞ্চে জীবন বিসর্জ্জন দেন। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে যে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হয়, তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন এই সত্যেন্দ্রনাথ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে মেদিনীপুরে সর্ব্বপ্রথম যে দশ সহস্রাধিক নরনারীর শোভাযাত্রা বাহির হয়, ক্ষুদিরাম ছিলেন সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে। সেই সময় যত কিছু স্বদেশী সভা-সমিতি হইত তাহার প্রত্যেক-টিতেই তিনি যোগদান করিতেন। বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপে ক্ষুদিরামের ছিল বিপুল উৎসাহ ও অদম্য কর্ম্মক্ষমতা। এই জন্যই তিনি নায়ক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিশেষ আস্থাভাজন ও প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন।

যে সকল কর্ম্মী মাতাপিতা ও বাড়ীঘর ছাড়িয়া গুপ্ত-সমিতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন তাহাদের বাসের জন্য সমিতির নিকটেই একটি আড্ডা ছিল। এই আড্ডা ঘরে একখানি তাঁত ছিল বলিয়া এই ঘরটির নাম ছিল তাঁতশালা। এক সময় ক্ষুদিরাম আত্মগোপন করিয়া কিছুদিন এই তাঁত-শালায় অবস্থান করিয়াছিলেন। গুপ্ত-সমিতির নিকটেই ছিল একটি কালীমন্দির। বিপ্লবী কর্ম্মিগণ অনেক সময়ে এই মন্দিরের দেবী-প্রতিমার সম্মুখে শপথ করিয়া বলিতেন—"শাদা পাঁঠা বলি দিয়া সেই রক্তে মায়ের পূজা করিব।" শাদা পাঁঠা অর্থে সাহেব।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার পরেই একবার ক্ষুদিরাম সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় তিনি পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া ক্ষুদিরাম কৃষকদের গৃহে কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

মেদিনীপুরের স্বদেশী আন্দোলনের সময় ক্ষুদিরাম ছিলেন বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের একজন পরম উৎসাহী কর্ম্মী। একবার তিনি একটি দোকান হইতে বিলাতী বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া বহ্ন্যুৎসব করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে এই সময় একটি শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ইহার সহকারী সম্পাদক। প্রদর্শনী দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। ক্ষুদিরাম প্রদর্শনীর ফটকের নিকট

দাঁড়াইয়া—"সোনার বাঙ্গালা" নামক বিপ্লবাত্মক কাগজ বিলি করিতেছিলেন। একজন হেড কনেষ্টবল আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতেই তিনি কনেষ্টবলের নাকে মুখে ভীষণ ঘুষি বসাইয়া দিলেন। কনেষ্টবলের নাকমুখ রক্তে ভাসিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিলেন। তিনি তখন মেদিনীপুরের ডেপুটির আদালতে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। তিনি কনেষ্টবলকে বলিলেন যে,—এ ডেপুটি বাবুর ছেলে, ইহাকে গ্রেপ্তার করা চলে না। ডেপুটি বাবুর কথা শুনিয়া কনেষ্টবল সভয়ে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। ক্ষুদিরাম অব্যাহতি পাইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই কনেষ্টবলের ভুল ভাঙ্গিল; বুঝিতে পারিল যে, ক্ষুদিরাম ডেপুটি বাবুর ছেলে নহে। তখন ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইল এবং মিথ্যা কথা বলার অপরাধে সত্যেন্দ্রনাথের চাকরী গেল।

ক্ষুদিরাম কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা রুজু হইল। উহাই বাংলাদেশে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রথম রাজদ্রোহের মামলা। প্রায় একমাস পরে ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়িলেন। তাঁহাকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইল। ক্ষুদিরাম যদি পুলিশের নিকট বিপ্লবীদিগের সমস্ত কথা বলিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় মেদিনী-পুরের বিপ্লববাদীরা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম সে প্রকৃতিতে গড়া নহেন। তাঁহার মনের জোর ও স্বদেশ-প্রীতি ছিল অসাধারণ। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও

ক্ষুদিরামের নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারিল না। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুদিরাম খালাস পাইয়াছিলেন। অত্যন্ত অল্প বয়স্ক বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল।

১৯০৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে একবার কংগ্রেস অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই দলের মধ্যে মত-বিরোধ হয়। ক্ষুদিরাম ছিলেন চরমপন্থী দলে। এই ঘটনার পরেই ক্ষুদিরামকে পাঠান হয় প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে মজঃফরপুরে মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য। এই সম্পর্কে প্রফুল্ল চাকী প্রবন্ধে সবই বলা হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যে বোমার আঘাতে মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ভ্রমে মিসেস ও মিস্ কেনেডী, নিহত হইয়াছিলেন তাহা ক্ষুদিরামই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার পর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী পরস্পর বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেন। ১লা মে তারিখে ক্ষুদিরাম উইনী ষ্টেশনের কাছে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

মজঃফরপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ কার্লডাফের এজলাসে ক্ষুদিরামের বিচার হয়। বিচারের সময় পুলিশ ক্ষুদিরামের মুখ হইতে বাংলার বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধে একটি কথাও বাহির করিতে পারে নাই। ১৯ বৎসর বয়সের কিশোর ক্ষুদিরাম ছিলেন এইরূপ কঠোর প্রকৃতিতে গঠিত। বিচারে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বদণ্ডাদেশই বহাল থাকে।

মজঃফরপুরে ১১ই আগষ্ট ভোর ছয়টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। ক্ষুদিরাম প্রফুল্লচিত্তে ও দৃঢ় পাদবিক্ষেপে ফাঁসী-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। এমন কি যখন তাঁহার মাথার উপর টুপী পরাইয়া দেওয়া হয় তখনও তিনি হাসিতেছিলেন। তাঁহার উকীল কালিদাস বাবু তাঁহার মৃতদেহের জন্য আবেদন করিলে সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়। গণ্ডক নদীর তীরে অনাড়ম্বর ভাবে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার শবদেহের সঙ্গে কয়েকজন লোক শ্মশানে গমন করে। রাস্তার দুই ধারে সহস্র সহস্র নরনারী ও পুলিশ দাঁড়াইয়া ছিল। পুলিশ জনতা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য যে হাজার হাজার তরুণ-দেশপ্রেমিক ফাঁসীর মঞ্চে, সুদূর আন্দামানে নির্ব্বাসনে, জেলের নিভৃতকক্ষে এবং পুলিশের ও সৈন্যদলের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন ক্ষুদিরাম তাঁহাদের সকলের পথপ্রদর্শক। ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া উনবিংশ বৎসর বয়স্ক তরুণ কিশোর ক্ষুদিরাম যেদিন স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই আরম্ভ হইল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়যাত্রা। তাঁহার অম্লান স্মৃতি নব জাগ্রত জাতির হৃদয়ে চিরদিন শক্তি সঞ্চার করিবে। তাঁহারই আত্মত্যাগের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের স্বাধীনতার মহাসৌধ।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে বাংলার অজ্ঞাত কবি যে অমর সঙ্গীত

রচনা করিয়াছেন তাহা একটু অদল বদল করিয়া বঙ্গের বহুস্থানে ভিখারী ও ভিখারিণীদের কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। গানটি এই—

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
শনিবার দিন দশটা বেলা
হাইকোর্টেতে গেল জানা
(ওমা) অভিরামের দ্বীপ চালনা
ক্ষুদিরামের ফাঁসী।

(ওমা) কলের বোমা তৈরী ক'রে
দাঁড়িয়ে ছিলাম লাইনের ধারে
(ওমা) বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী।

হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা,
(ওমা) রক্তমাংসে এক করিতাম
দেখত ভারতবাসী।

থাকতো যদি মা টাট্টু ঘোড়া
ক্ষুদিরাম কি পড়তো ধরা
(ওমা) এক চাবুকে চলে যেতাম
গয়া গঙ্গা কাশী।

বেলা দশটা বেজে গেল
ফাঁসীর হুকুম জারী হ'ল
(ওমা) হাসি হাসি পরব ফাঁসী
দেখুক ভারতবাসী।

দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব খুড়ীর ঘরে,
চিন্‌তে যদি না পারিস মা
গলায় দেখিস ফাঁসী।

(ওমা) মনের দুঃখ মনে রইল
আমার হলোনা স্বদেশী।

কাচের বাসন কাচের চুড়ী
প'রনা মা বিলাতী শাড়ী,
এ মিনতি করি, মাগো
ভুলনা স্বদেশী।

ক্ষুদিরাম স্মরণে

(গান)

রক্ত তোমার ব্যর্থ হয়নি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম—
বহ্নি-জ্বালায় ছেয়ে দিয়ে গেছ দেশের শহর-গ্রাম।
ধনী জাগিয়াছে, জেগেছে কিষাণ—
উঠেছে বাজিয়া প্রলয়-বিষাণ
বিদেশীর কাছে আবেদন নয়, শুধু চির-সংগ্রাম।

মুক্তির শ্বাস ফেলে মোরা বাঁচি স্বদেশের কারাগারে
হাসিছে স্বরাজ-সূর্য্য এবার দুঃখের পারাবারে।
অগ্নিযুগের প্রথম সেনানী—
রক্তাক্ষরে রেখে গেছ বাণী
তোমার স্মরণে জনগণ রাখে প্রথম প্রণাম—
মুক্তি-পথের অভিযাত্রীর পূরিল মনস্কাম।

— গোপাল ভৌমিক

শহীদ কানাইলাল দত্ত



কানাইলালের পৈত্রিক বাটী শ্রীরামপুরে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার মাতুলালয়ে চন্দননগরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জন্মাষ্টমী তিথিতে। তাঁহার পিতার নাম ৺চূণীলাল দত্ত এবং জননীর নাম ৺ব্রজেশ্বরী দেবী। কানাইলালেরা দুই ভাই, সাত বোন। তাঁহার দাদার নাম আশুতোষ বলিয়াই তাঁহার নাম সর্ব্বতোষ রাখা হয়, কিন্তু তিনি কানাইলাল নামেই পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

শৈশবে তাঁহার চারি পাঁচ বৎসর মায়ের সঙ্গে মাতুলালয়েই অতিবাহিত হয়। তাহার পর তিনি মায়ের সঙ্গে তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল বোম্বাই-এ গমন করেন। তথাকার আর্ট হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া তিনি পড়াশুনা করিতে থাকেন। এই স্কুলে তাঁহার প্রায় নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাটে। তারপর আবার তিনি চন্দননগরে আসেন, কিছুদিন এখানে থাকিয়া আবার বোম্বাই-এ চলিয়া যান। কয়েক বৎসর

পরে আবার চন্দননগরে আসেন এবং এখানকার ডুপ্লে কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন।

এই চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজ হইতেই কানাইলাল এফ, এ, পরীক্ষাতেও বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। স্বীয় সৎস্বভাবের গুণে তিনি তথাকার অধ্যাপক চারু রায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। চারুবাবু তাঁহাকে ইতিহাস ও অর্থনীতি যত্নের সহিত পড়ান। চারুবাবুর প্রভাবেই কানাইলাল স্বদেশী ও বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হন।

নানা কারণে ডুপ্লে কলেজে কানাইলালের বি, এ, পড়া হয় নাই। তিনি হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বি, এ, পড়িতে থাকেন। ১৯০৮ সালে তিনি বি, এ, পরীক্ষা দেন এবং ইতিহাসে অনার্স লইয়া কৃতিত্বের সহিত পাস করেন। বোমার মামলার সংশ্রবে যখন তিনি জেলে আবদ্ধ, সেই সময় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ পান।

কানাইলাল ছিলেন দীর্ঘকায় ও শীর্ণশরীর। গায়ের রং ছিল শ্যামবর্ণ। তাঁহার শান্ত ও আয়ত চক্ষুর্দ্বয় তাঁহার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিলেন।

চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়কে কেন্দ্র করিয়া তথায় একটি বিপ্লব-চক্র গড়িয়া উঠে। তাঁহার পরিচালনায় তথায় লাঠিখেলা, অসিচালনা, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ তাড়াইবার নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের পরামর্শ হইত। এই

বিপ্লব-চক্রের সভ্যদিগের মধ্যে কানাইলাল ছিলেন অন্যতম। তিনি চারুবাবুর শিক্ষায় মুষ্টিযুদ্ধ ও বন্দুক চালনায় বিশেষ সুদক্ষ হইয়া উঠেন।

গঙ্গার ধারের চটকলের মাতাল ফিরিঙ্গিরা প্রায়ই রাত্রে পাড়ার মধ্যে ঢুকিয়া হল্লা ও উৎপাত করিত। কানাইলাল তাহাদের সতর্ক করা সত্ত্বেও তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করিত না। একদিন কানাইলাল মুষ্ট্যাঘাতে তাহাদের দুই জনকে বিশেষ রকমে জখম করেন, তৃতীয় ব্যক্তি পলাইয়া আত্মরক্ষা করে।

১৯০৭ সালে চন্দননগরে একটি সার্কাস দল আসে। সেখান হইতে তাহাদিগকে চলিয়া যাওয়ার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তাহারা সেই অনুরোধে কর্ণপাত করে না। তখন কানাইলাল অপর কয়েকজন বন্ধুর সহিত ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেন। প্রথমে অনুরোধ উপরোধ, তারপর কথা কাটাকাটি এবং পরে ঘুষাঘুষি আরম্ভ হয়। কানাইলালের ঘুষিতে ম্যানেজার রক্তবমি করিতে থাকে।

কানাইলাল বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বিশেষ নিষ্ঠা ও প্রাণ দিয়া তিনি তাহা সম্পাদন করিতেন।

শেষে একদিন চাকরীর সন্ধানে কলিকাতা যাওয়ার নাম করিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া কানাইলাল গৃহ ত্যাগ করেন। আর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

মানিকতলার বাগানে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি বোমার আড্ডা স্থাপিত হয়,—সমগ্র-ভারতে বিপ্লব-আন্দোলন প্রচারের

জন্য ও ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়নের নিমিত্ত। এইস্থানে এবং আরও নানা যায়গায় বৈপ্লবিকদলের ছেলেদিগকে রাখা হইত।

১৯০৭ সালের শেষের দিকে কানাইলাল বিপ্লবীদলে যোগ দেওয়ার জন্য কলিকাতায় আসিয়া উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। কেহ বৈপ্লবিক দলে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে নেওয়া হইত না। বহু পরীক্ষা করিয়া তবে লওয়া হইত, অনেককেই ফিরাইয়া দেওয়া হইত। উপেন্দ্রনাথের সহিত কানাইলালের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল, তাই তিনি তাঁহার সহিত দেখা করেন।

কানাইলালের সেই বৎসরই পরীক্ষা দেওয়ার কথা। তাই উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সেবার ফিরাইয়া দিয়া পরীক্ষা দেওয়ার পর পুনরায় দেখা করিতে বলিয়া দেন।

বি, এ, পরীক্ষার পর কানাইলাল আবার ফিরিয়া আসেন এবং চাঁপাতলায় যুগান্তর আফিসে অবস্থান করিতে থাকেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে তখন তিনি বড় দুর্ব্বল, তাই তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুরীতে পাঠান হয়। পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুদিন গোয়াবাগানের বাসায় থাকেন।

ধর্ম্মের দিকে যাঁহাদের বিশেষ টান ছিল, তাঁহাদিগকেই মাণিকতলার আড্ডায় রাখা হইত। তাঁহারাই ছিলেন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী। আর যাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি টান ছিল না, তাঁহাদিগকে রাখা হইত অন্যত্র।

ধর্ম্মের দিকে তেমন টান না থাকায় কানাইলালকেও মাণিকতলার আড্ডায় বেশীদিন রাখা হয় নাই। তাঁহাকে অন্যত্র পাঠান হইয়াছিল। চট্টগ্রামের কোনও কারখানায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি থাকিতে পারিলেন না ; কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

এইবার তাঁহাকে পাঠান হইল ভবানীপুরের এক কেন্দ্রে বোমা প্রস্তুত শিখিবার জন্য। এইখানে কানাইলাল প্রভৃতি ছয়সাত জন ছেলে থাকিয়া হেমচন্দ্র কানুনগোর নিকট বোমা তৈরী শিক্ষা করিতেন। এখানে তাঁহারা অতি সাধারণ-ভাবে থাকিতেন, রান্নাবান্না করা ও বাসন-কোসন ধোয়া তাঁহারা নিজেরাই করিতেন। তাঁহাদের খাদ্যও ছিল অতি নিকৃষ্ট।

ভবানীপুরের আড্ডার উপর পুলিসের নজর পড়ায় সেখানকার লোকেরা সেই বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া ১৫নং গোপী-মোহন দত্তের লেনে উঠিয়া আসেন। এইস্থানে কানাইলাল ও নিরাপদ রায় বামাল ২রা মে তারিখে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। ২।১ দিনের মধ্যেই আরও বহু আড্ডার বহু লোক গ্রেপ্তার হন। কানাইলাল পুলিসের কাছে নামধাম প্রকাশ করেন নাই।

গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিন পরেই সকলকে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠান হয়। এইখানে সকলে খুব স্ফুর্ত্তিতে কাটান,—কেহ স্বদেশী গান করেন, কেহ নাচেন। সকলকেই রাত্রের আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে হইত।

এই সময়ে মেদিনীপুর জেলা হইতে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে

মাণিকতলার বোমার মামলার সংশ্রবে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া আসা হয়। তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক কেন্দ্রের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

শ্রীরামপুরের জমিদার-পুত্র নরেন গোঁসাইও এই মামলার সংশ্রবে গ্রেপ্তার হইয়া প্রেসিডেন্সী জেলে আসে। সে শেষ পর্য্যন্ত পুলিস ও তাহার পিতার চেষ্টায় রাজসাক্ষী হয়। রংপুরে এবং বাঁকুড়ায় তাহাদের জমিদারীতে কয়েকটা ডাকাতির চেষ্টায়, চন্দননগরের মেয়রের প্রাণনাশের চেষ্টায় এবং আরও কয়েকটা বৈপ্লবিক কার্য্যে নরেন গোঁসাই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

নরেন রাজসাক্ষী হইতে স্বীকৃত হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া তাহাকে ইউরোপীয় ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করে। জেলের ভিতর চলাফেরা করিবার সময় লিণ্টন ও হিগিন্স নামক দুইজন ইউরোপীয় কয়েদীকে তাহার দেহরক্ষিরূপে দেওয়া হইত। রাজসাক্ষী হওয়ায় সে যে সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই তাহার সঙ্কল্প ছিল যে, বোমার মামলার অবসানের পর সে সপরিবারে বিলাতে চলিয়া যাইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী জেলে আসিয়াই হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। তিনি নরেন গোঁসাইএর রাজসাক্ষী হওয়ার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহার জীবন-নাশের সঙ্কল্প করেন। তিনি নরেনকে জানাইলেন যে, তিনিও রাজসাক্ষী হইতে সংকল্প করিয়াছেন; সুতরাং, তাহার সহিত পরামর্শ করা দরকার। নরেন এই সংবাদে খুব উৎসাহিত

হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া সত্যেনের সহিত দেখা করে। এইরূপে নরেন সত্যেনের ফাঁদে ধরা পড়ে। সে বুঝিয়াছিল যে, একজন সমর্থক পাইলে ভাল হয়, নতুবা তাহার একার কথায় মোকদ্দমায় বিশেষ জোর হইবে না।

বারীন্দ্রের চেষ্টায় একটা রিভলবার যোগাড় হয়। সত্যেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বারীন্দ্র কর্ত্তৃক আনীত রিভলবারের সাহায্যেই নরেনকে বধ করা। এই রিভলবারটি আসিলে তাহা রক্ষার ভার থাকে হেম কানুনগোর উপর। তিনি একদিন কাপড় জড়াইয়া রিভলভারটি লইয়া গিয়া হাসপাতালে সত্যেনকে দিয়া আসেন। এই রিভলবারটি ছিল বড় এবং মরিচা ধরা। এইটি দিয়া কাজ করিতে গেলে হয়ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি উহা ব্যবহার না করিয়া দ্বিতীয় রিভলবারের অপেক্ষায় থাকেন।

এদিকে প্রায় প্রত্যহই হাসপাতালে নরেনের সঙ্গে সত্যেনের গোপন পরামর্শ চলিতে লাগিল। সত্যেন কিন্তু নরেনকে সত্য কথা কিছুই বলিতেন না। নানা মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা নাম ও ঘটনার কথা তাহাকে বলিতেন। নরেনের বিশ্বাস ছিল, সত্যেন তাহাকে সত্য কথাই বলিতেছে।

শেষে দ্বিতীয় রিভলবারটিও আসিয়া জেলে পৌছিল। ইহা রক্ষার ভারও পড়িল হেম কানুনগোর উপর। কিরূপে এই রিভলবারটি জেলের মধ্যে তাহাদের হাতে আসিল, তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। তবে ইহা প্রকাশ পাইয়াছিল যে, কানাইলালের জনৈক আত্মীয় পাকা কাঁঠালের মধ্যে পূরিয়া দুইটি রিভলবার জেলের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন।

আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ হইয়া গেলে এইবার তাঁহাদের প্রস্তুত হইবার সময় আসিল। ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা কানাইলাল গল্প করিতে করিতে হঠাৎ পেটে হাত দিয়া শুইয়া পড়িলেন,—তাঁহার ভয়ানক পেটের ব্যথা হইয়াছে। ডাক্তার আসিলেন, কানাই হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে চাহিলেন। অনুমতি পাইতে বিলম্ব হইল না। হাসপাতালে সত্যেন ও কানাই একই প্রকোষ্ঠে স্থান পাইলেন। এই ঘটনা ঘটে ৩১শে আগষ্ট রবিবার বৈকালে। কানাই-সত্যেনের মধ্যে গোঁসাই হত্যার গোপন পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরামর্শে ঠিক হয়, সত্যেন হাসপাতালের মধ্যে গোঁসাইকে খুন করিবার চেষ্টা করিবেন আর কানাই বারান্দায় থাকিবেন, সত্যেনের চেষ্টা যদি কোন কারণে ব্যর্থ হয় কানাই তখন তাহা সম্পন্ন করিবেন।

সোমবার সকালে নরেন গোঁসাই হাসপাতালে আসিয়া সত্যেনের সঙ্গে দেখা করে। হিগিন্স দেহরক্ষীরূপে সঙ্গে আসে নরেন আসিবামাত্র সত্যেন তাহাকে বিশেষ আপ্যায়ন সহকারে বসিতে দেন। কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ দিবার জন্য হিগিন্স দূরে সরিয়া যায়। কানাইলাল দাঁত মাজার ভাণ করিয়া বারান্দায় রিভলবার লইয়া পায়চারী করিতে থাকেন।

সত্যেন পকেটে হাত রাখিয়াই নরেনের দিকে পিস্তল লক্ষ্য করেন। গুলি নরেনের উরুতে বিদ্ধ হয়।

'বাবারে, খুন কল্লে' বলিয়া নরেন ছুটিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। হিগিন্স গুলির শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া

সত্যেনের হাত হইতে রিভলবারটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, তখন উভয়ে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়; সত্যেনের একটা গুলি হিগিন্‌সের মণিবন্ধ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সত্যেনের এক লাথি খাইয়া সে মাটিতে পড়িয়া যায়; উঠিয়া সে পলায়ন করে।

কানাই তাড়াতাড়ি নরেনের অনুসরণ করেন। তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসেন এবং গেটের দিকে ছুটিয়া যান। গেটের প্রহরীর দিকে রিভলবার লক্ষ্য করিতেই সে গেট খুলিয়া দিয়া নরেনের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া দেখাইয়া দেয়। গেট হইতে বাহির হইয়াই কানাই নরেনের পিঠে গুলি করেন। এই সময় সত্যেনও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হন এবং গুলি ছুড়িতে থাকেন। নরেন রক্তাক্ত কলেবরে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইতে থাকে। কানাই এবং সত্যেনও গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার পশ্চাতে ছুটেন।

এমন সময় জেলার ও লিণ্টন অগ্রসর হইয়া আসিতেই কানাই ও সত্যেন তাহাদিগের প্রতি রিভলবার লক্ষ্য করেন, তাহারা পলাইয়া যায়। সত্যেন ও কানাই অগ্রসর হইতে থাকেন। লিণ্টন আবার ফিরিয়া আসিয়া সত্যেনকে জড়াইয়া ধরে; কিন্তু সত্যেন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন। এমন সময় লিণ্টন টের পাইল যে, তাহার কাণের পাশ দিয়া একটা গুলি ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। সে মাথা উঁচু করিয়া দেখে যে, নরেন গুলি খাইয়া নর্দ্দমার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। এই সময় সত্যেন নরেনের উপর আর এক দফা গুলি চালান।

ইহার পর কানাইলাল ড্রেনে পতিত নরেনকে আর একটা গুলি করেন।

নরেনের জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া কানাই ও সত্যেন নিজ নিজ হাতের পিস্তল ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। তখন তাঁহাদিগকে ধরিয়া জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

নরেনকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার ঘৃণিত জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

কানাই ও সত্যেন নরেনের উপর নয়টি গুলি বর্ষণ করেন। চারিটি গুলি তাহার দেহে বিদ্ধ হয়। একটি হাসপাতালে, তুইটি বাহিরে, অপরটি শেষ গুলি।

কানাই জেল-কর্ত্তৃপক্ষের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"নরেন দেশের শত্রু, তাই তাহাকে হত্যা করিয়াছি।"

আলিপুরের সেসন্স জজ মিঃ এফ আর রো-র এজলাসে গোঁসাই-হত্যার বিচার আরম্ভ হয়। এই দিন আদালত-গৃহে খুব কড়া পাহারা বসে।

জজ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কানাইলাল বলেন, "আমার যা বলবার তা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেই বলেছি; আমার আর কিছু বলবার নাই। আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু বলতে চাই না। আমার কোনও উকিল নাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, "আমি দোষী নই।"

জজ কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি পূর্ব্বের কোনও কথা প্রত্যাহার করতে চাও কি?"

কানাই বলেন, "হ্যাঁ। আমি সেদিন বলেছিলাম, 'আমি ও সত্যেন্দ্রনাথ এই খুনের জন্য দায়ী'—কেবল এই কথাটি প্রত্যাহার করতে চাই। এখন বলতে চাই, 'একা আমিই খুন করেছি, আর কেউ আমাকে সাহায্য করে নি'।"

জজ ও জুরীরা কানাইলালকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। কানাই-এর ফাঁসীর হুকুম হয়।

সত্যেন্দ্রনাথকে দুই জন শ্বেতাঙ্গ জুরী দোষী এবং তিনজন দেশীয় জুরী নির্দ্দোষ বলেন। সুতরাং সত্যেন্দ্রের বিচারের জন্য মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠান হয়। হাইকোর্টের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসীর হুকুম হয়।

ফাঁসীর হুকুম বহাল হওয়ার পর হইতে কানাইকে অধিকতর প্রফুল্ল দেখা যায়। কানাই-এর এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'নির্ব্বাসিতের আত্ম-কথায় লিখিয়াছেন,—"যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে! আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে; জীবনের বাকী কয়টা দিন থাকিবেও। জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই,—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে, সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন,

যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে, আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসীকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন। প্রহরীর নিকট শুনিলাম, ফাঁসীর আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে যাহা পাতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই।........"

দণ্ডাদেশের পর কানাইলাল আপীল করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

কানাইলালের মা ও বড় ভাই কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। প্রত্যেক বারই কানাই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। তিনি তাঁহার মাকে বলিয়াছেন, "আমার জন্য তোমরা কিছু ভাবিও না, আমি বেশ আছি, আমি ভাল যায়গায় যাইতেছি।"

মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার কিছু খাইতে ইচ্ছা করে কি না?

কানাই বলেন, "যাহা দরকার তাহাত পাইতেছি মা, এর উপর আর আমার কিছুই চাই না।"

১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার কানাইলালের ফাঁসীর দিন নির্দ্ধারিত হয়।

ঐদিন ভোর ছয়টার সময় কানাইলালের কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কানাইলালের দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতি তাঁহাকে লইয়া বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হন।

মৃত্যুঞ্জয়ী বীর স্বাধীনতার অগ্রদূত প্রফুল্ল বদনে দৃঢ় পাদবিক্ষেপে চলিতে থাকেন। তাঁহার সেই স্নিগ্ধ প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে নির্ব্বিকার শান্ত ভাব দেখিয়া তখন অনেক দর্শকই অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই।

কানাই ধীরে ধীরে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেন।

কানাই-এর গলায় ফাঁসীর দড়ি পরান হইল। তিনি জল্লাদকে বলিলেন, "দড়িটা বড় কড়া হ'য়েছে, গলায় লাগছে।"

আবার ঠিক করিয়া ফাঁসীর দড়ি পরান হইল। তাঁহার মুখে আবরণ দিয়া জল্লাদ নামিয়া আসিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার পায়ের তলার তক্তা সরিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দেহ ঝুলিয়া পড়িল। সব শেষ হইয়া গেল।

ন'টার কিছু পরে কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ দত্ত, মতিলাল রায় এবং আরও কয়েকজন একটা কৃষ্ণ কম্বলে আবৃত কানাইএর শবদেহ জেলের বাহিরে লইয়া আসিলেন। সেখানে আরও বহু লোক জমা হইয়াছিল। কানাই-এর ললাটে রক্ত-চন্দনের টীকা পরাইয়া দেওয়া হইল, পুষ্পদামে তাঁহার দেহ ভরিয়া গেল। তাঁহাকে একখানা লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া দেওয়া হইল ও গলায় একখানা কোচান চাদর দেওয়া হইল। তাহার পর সকলে সেই শবদেহ বহন করিয়া কালীঘাটের শ্মশানে লইয়া গেল। তখন চতুর্দ্দিকের বাড়ীর ছাদ হইতে শত শত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।

বহু নরনারী কানাই-এর দর্শনলাভের জন্য শ্মশানে সমবেত হইয়াছিল। শ্মশানে এত বড় মিছিল আর ইহার পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। অনেকে কানাই-এর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিল। মুহুর্মুহুঃ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতে লাগিল। ফুলের মালায় ও পুষ্পস্তবকে কানাই-এর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গিয়াছিল।

চন্দন কাষ্ঠের চিতা সজ্জিত হইল। তাহার উপর কানাই-লালের ঘৃতলিপ্ত দেহ তুলিয়া দেওয়া হয়। কানাইলালের দাদা চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন। ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠে।

অপরাহ্ণে চিতানল নির্ব্বাপিত হইল। তখন চিতাভস্ম নেওয়ার জন্য জনতার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।

কানাইলাল মরিয়াও বাঙ্গালীর হৃদয়ে অমর হইয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন একটু দূরে বসিয়া সাশ্রু নয়নে গাহিতেছিলেন—

ভাই কানাই, যাওরে অনন্ত ধামে
মোহ মায়া পাশরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাই।
যায় যেথা সত্যব্রত, বীরব্রত, পুণ্যবান্,
যাও তুমি, যাও সেই দেব-সদনে।

শহীদ সত্যেন বসু



১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই রবিবার বাংলা ১২৮৯ সালের ১৫ই শ্রাবণ বেলা ৯টা ৪৫ মিনিটে রাখী-পূর্ণিমার দিন সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ঋষিকল্প সংস্কারক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ বসু মহাশয়ের পুত্র। ইহারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথেরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোন।

ছয় বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। লেখাপড়ায় তিনি বেশ সুনাম অর্জ্জন করেন। প্রতি বৎসরেই তিনি পরীক্ষায় শ্রেণীস্থ বালকদিগের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার ব্যবহার ছিল অতি অমায়িক ও সরল। তাঁহার মনের বল ও সত্যবাদিতা ছিল অসাধারণ। এই গুণেই তিনি সকলের সহিত মেলামেশা করিতে পারিতেন

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পনেরো বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মেদিনীপুর কলেজে এফ্. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হন। এই কলেজ হইতে এফ্. এ. পাস করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন এবং সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বি. এ. পড়িতে থাকেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁহার আর বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয় না। ডাক্তারী পরীক্ষায় স্থির হয় যে, তাঁহার রাজযক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা। ডাক্তারদের উপদেশক্রমে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার মা তাঁহাকে লইয়া কিছুদিন ওয়াল-টেয়ারে বাস করেন। সেখানে বাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি ঘটে।

ওয়ালটেয়ার হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে মেদিনীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন কলিকাতায় ও মেদিনীপুরে সবেমাত্র গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০২ সালের শেষ ভাগে সত্যেন্দ্রনাথ অরবিন্দ ঘোষ কর্ত্তৃক বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর মিঞাবাজারের একটি বাড়ীতে কুস্তির আখড়া খোলা হয়। সেখানে লাঠিখেলা, অসি শিক্ষা, সাইকেল চড়া, অশ্বারোহণ, বকসিং, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত।

ইহার কিছুকাল পরেই কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত আপার সার্কুলার রোডের বৈপ্লবিক সমিতিতে সত্যেন্দ্রনাথ যোগদান করেন। এই আড্ডার নেতৃত্বের ভার ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। কিছুদিন পরেই সত্যেন্দ্রনাথের উপর একটা মিথ্যা অভিযোগ চাপান হয়, ইহাতে সত্যেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া মেদিনীপুরে চলিয়া যান।

তিনি মেদিনীপুরে আসিয়া খড়্গাপুরে কেল্‌নার কোম্পানীর হোটেলে একটি কেরাণীগিরির কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং নূতন উদ্যমে মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। মেদিনীপুরের আড্ডা তখন প্রায় উঠিয়া যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা স্কুল-কলেজের ছাত্র মহলে বিপ্লববাদ প্রচারের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। এই সব ছাত্রদিগের মধ্যে তিনি যাহাকে উপযুক্ত মনে করিতেন তাহাকে গুপ্ত সমিতির কার্য্যে দীক্ষা দান করিতেন।

যখন বঙ্গবিভাগ রহিত করিবার জন্য তীব্র স্বদেশী আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে সত্যেন্দ্রনাথ তখন কেল্‌নার কোম্পানীর চাকরী পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর কালেক্টারীতে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে একটি ঘর ভাড়া করিয়া একটি গুপ্ত সমিতির আড্ডা খোলেন। এই আড্ডাটির নাম দেওয়া হয় তাঁতশালা। এখানে তাঁতে সব সময়েই একখানা অর্দ্ধ সমাপ্ত কাপড় দেখিতে পাওয়া যাইত। ক্ষুদিরাম প্রভৃতি কয়েকজন এই সমিতিতে যোগদান করেন। দলের লোক ব্যতীত অপর কেহ এই তাঁতশালা দেখিতে আসিলে তাঁতখানা চালাইয়া দেখান হইত যে, এখানকার সকলেই তাঁতী, তাঁত বোনাই তাঁহাদের কাজ। আসলে কিন্তু তাঁহারা ছিলেন চরম বিপ্লবপন্থী। কিরূপে কোথায় পিকেটিং করিতে হইবে, কোথায় বিলাতী কাপড়ের দোকানে আগুন ধরাইয়া দিতে হইবে, কোথায় লবণের গাড়ী উল্টাইয়া দিতে হইবে, কোথায় বিলাতী মাল বোঝাই নৌকা ডুবাইয়া দিতে হইবে ইত্যাদি ছিল তাঁহা-

দের প্রধান জল্পনা-কল্পনা। সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন এইসব কাজের মন্ত্রণা-দাতা ও উদ্যোক্তা।

কোনও লোক বিলাতী কাপড় কিনিলে কোন্ পথে সে যায় তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তাহাকে বিলাতী কাপড় ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করা হইত, কিন্তু তাহা না শুনিলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।

১৯০৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয় মেদিনীপুরে। ইহা অনুষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মকর্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এই সময় দেশের নেতারা 'চরমপন্থী' ও 'নরমপন্থী'—এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। দুই দলে ভয়ানক বিরোধ আরম্ভ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক রুল জারি করেন যে, যদি ইহাতে কোনও অনর্থ সাধিত হয়, তবে তাহার জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে দায়ী হইতে হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও উদ্যমে বাসন্তীতলা নামক স্থানে চরমপন্থীদিগের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র-ভাণ্ডার, বড়বাজার ও মিঞাবাজারে বৈপ্লবিক আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। সমুদয় আখড়াতেই রীতিমত ভাবে নানা প্রকার শরীর-চর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁহার দাদার বন্দুকটি আখড়ায় লইয়া যাইতেন। ছেলেরা সব বন্দুকটি দেখিয়া পরম উৎসাহিত হইত।

একবার সত্যেন্দ্রনাথ একজন শিক্ষককে লাঠ্যৌষধি প্রদান করিয়া তাঁহার কৃতকর্ম্মের সমুচিত শিক্ষা দান করেন। শিক্ষকটি ছিলেন গভর্ণমেণ্টের ভয়ানক ধামাধরা, তিনি বৈপ্লবিক কার্য্যে

নানা ভাবে বাধা প্রদান করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে একদিন দুপুর রাত্রে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পথের মাঝে তাঁহাকে লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী করা হয়। তাঁহার কাণ দুইটি কর্ত্তন করিয়া দেওয়া স্থির হইয়াছিল ; কিন্তু ঐ সময়ে ডাক-হরকরা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় শিক্ষক মহাশয়ের কাণ দুইটি রক্ষা পায়।

এই সময় বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য 'ছাত্র-ভাণ্ডার' খোলা হইয়াছিল। মেদিনীপুরেও সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টায় একটি বড় রকমের ছাত্র-ভাণ্ডার খোলা হয়। ইহাতে তাঁতশালার অস্তিত্ব লোপ পায়।

বিশেষ বিশেষ বিপ্লব-কর্ম্মীরা সত্যেন্দ্রনাথের সহিত হেমচন্দ্র কানুনগোর বাড়ী যাইয়া রিভলভার ছোড়া অভ্যাস করিতেন। মাঝে মাঝে হেমবাবু সকলকে লইয়া শিকারে যাইতেন।

ক্ষুদিরামের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় হয় মেদিনীপুরে। সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামের ঐকান্তিকতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিপ্লবধর্ম্মে দীক্ষা দেন। দীক্ষা-দানের সময় তিনি ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেশের জন্য মরতে পারিস্ ?" ক্ষুদিরাম নির্ভীকভাবে উত্তর দেন, "পারি বই কি !"

১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে যে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী হয় তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথের লিখিত "সোনার বাংলা" নামক একটি প্যাম্পলেট বিলি করার অপরাধে ক্ষুদিরাম যখন ধৃত হন তখন সত্যেন্দ্রনাথই ক্ষুদিরাম ডেপুটিবাবুর ছেলে—এই মিথ্যা কথা বলিয়া ক্ষুদিরামকে পুলিসের হাত

হইতে ছাড়াইয়া লন। অবশেষে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য সত্যেন্দ্রনাথের কালেক্টরীর কেরাণীগিরি চাকরীটি যায়। চাকরী হইতে অব্যাহতি পাইয়া সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

মজঃফরপুরে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম কর্ত্তৃক বোমা-বিভ্রাট উপলক্ষে একদিন সহসা মেদিনীপুর শহরের পাড়ায় পাড়ায় সশস্ত্র পুলিসের আবির্ভাব দেখা গেল। রাত্রি চারিটা হইতেই বন্দুকধারী পুলিসেরা সত্যেন্দ্রনাথের ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ী অবরোধ করে। ফলে বিনা লাইসেন্সে বন্দুক রাখার অপরাধে পুলিস সত্যেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। পুলিশ বলে, ক্ষুদিরামের নিকটে যে রিভলবারটি পাওয়া যায় তাহা সত্যেন্দ্রনাথই তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

বিচারে সত্যেন্দ্রনাথের দুই বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। পরে আলিপুর বোমার মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর হইতে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া আসা হয়।

প্রেসিডেন্সী জেলে আসিয়া সত্যেন্দ্রনাথ নানা অসুখ বিসুখের অছিলায় জেল-হাসপাতালে ভর্ত্তি হন এবং এই-খানেই দিন কাটান।

এখানে আসিয়াই তিনি নরেন গোঁসাই-এর রাজসাক্ষী হওয়ার সংবাদ পান এবং তাহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করেন।

নরেন গোঁসাই-এর হত্যাকাণ্ডের সমস্ত বিষয়ই 'শহীদ কানাইলাল' প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

২১শে অক্টোবর বুধবার কলিকাতা হাইকোর্টের জজ সফরুদ্দিন ও মিঃ কক্সের কোর্টে সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসীর হুকুম হয়।

এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা স্থিরীকৃত হয়। প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করিতে ১৫ হাজার টাকার দরকার বলিয়া পরের শুক্রবার লর্ড মর্লির নিকট দণ্ডাদেশ রহিত করার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। লর্ড মর্লি তারযোগে জানান যে, তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহার পর রাজার নিকট জরুরী তার প্রেরণ করা হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উহা রাজার নিকট না পাঠাইতে তার-বিভাগকে আদেশ দেন। সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-ভিক্ষার সমুদয় আয়োজনই নিষ্ফল হইল।

দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির পর সত্যেন্দ্রনাথ সেজন্য কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। যাঁহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিয়াছেন।

তাঁহার ভগিনী সুরবালা দেবী তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সুবোধ (ছোট ভাই) স্বেচ্ছায় আমেরিকায় গিয়াছে। মায়ের ধন মায়েরই আছে, কিন্তু চর্ম্মচক্ষে তিনি যেমন তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না, সেইরূপ আমিও অত্যন্ত ইচ্ছা ও আগ্রহের সঙ্গে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক হৃদয়ে অন্য এক ধামে যাইতেছি। আমি সেখানেও তাঁহারই থাকিব, কেবল আমার দেহ থাকিবে না। অতএব তিনি যেন আমার জন্য খেদ না করেন। তাঁহাকে ভাবিয়া দেখিতে বলিও যে, অমর আত্মাকে বিনাশ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তাঁহাকে মাত্র ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। শাস্ত্রী মহাশয় লোহার গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বলুন, কিরূপে শান্তিতে মরিতে হয়?" শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "তোমার পিতা ও পিতৃব্যকে স্মরণ কর। তাঁহারা উভয়েই ধার্ম্মিক ছিলেন। তুমি তাঁহাদের কাছেই যাইতেছ। পৃথিবীর চিন্তা পরিত্যাগ কর। তুমিত জানই যে, একদিন না একদিন পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। অতএব প্রস্তুত হওয়া তোমার পক্ষে কষ্টকর নহে। আবেদনের উপর অধিক নির্ভর করিও না। নিশ্চিন্ত হও যে, তোমাকে প্রাণদান করিতেই হইবে। তোমার খ্যাতনামা পিতৃব্য ৺রাজনারায়ণ বসুকে স্মরণ করে ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর ও তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে দৃঢ়চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।" সত্যেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করেন, "হে ভগবান্, আমাকে শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিতে শিক্ষা দাও। আমাকে বল দাও। হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পিতা, আমি তোমার নিকট যাইবার জন্য পিপাসার্ত্ত হইয়াছি।"

২১শে নভেম্বর ৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার দিনটি বাংলার জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই দিন সত্যেন্দ্রনাথ ফাঁসীর মঞ্চে জীবন আহুতি প্রদান করেন।

ইতিপূর্ব্বে শহীদ কানাইলালের শবদেহ খুব ঘটা করিয়া

দাহ করা হইয়াছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথের শবদেহ বাহিরে আনিতে দেন নাই। জেল-প্রাচীরের মধ্যেই বিনা আড়ম্বরে তাঁহার সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়।

সত্যেনের দশজন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের হাতে তাঁহার শবদেহ প্রদান করা হয়। তাঁহারা বিনা আড়ম্বরে জেলের মধ্যেই চিতা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। কাহাকেও চিতাভস্ম পর্য্যন্ত নিতে দেওয়া হয় না।

বাহিরে তাঁহার শবদেহ না পাওয়ায় তাঁহার কুশমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট হইতে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(বাঘা যতীন)



১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত বাংলায় যে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত ছিল, যতীন্দ্রনাথ তাহার সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বারীন ঘোষ প্রভৃতির পর তিনিই বাংলার বিপ্লব-ক্ষেত্র কর্ম্মময় রাখিয়াছিলেন, তাঁহার চেষ্টাতেই বাংলার বিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার মাতুলালয়ে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যতীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমায় রিসখালি গ্রামে। যতীন্দ্রনাথ শৈশবে পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন, তখন হইতে তিনি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন ও শিক্ষালাভ করেন।

কয়ার চট্টোপাধ্যায়েরা যতীন্দ্রনাথের মাতুল বংশ। এই

বংশ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উদার মনোভাবে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এই বংশ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। স্বদেশী আমলের বহু সভাসমিতি ইঁহাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হইত। এই প্রকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের শৈশব-জীবন অতিবাহিত হওয়ায় তাঁহার মধ্যে স্বদেশীর বীজ উপ্ত হয়; কালে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া মহাবৃক্ষে পরিণত হয়।

যতীন্দ্রনাথের বড় মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরে একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার বাসায় থাকিয়া সেখান হইতে কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলে পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

যতীন্দ্রনাথ খুব সাহসী ছিলেন। তিনি যখন কৃষ্ণনগর স্কুলে পড়িতেন তখন একদিন তথাকার উকীল বারাণসী রায়ের একটা দুর্দ্দান্ত ঘোড়া ছাড়া পাইয়া শহরময় ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, কেহই উহাকে ধরিতে পারিতেছিল না। যতীন্দ্রনাথ তখন রাস্তার একটি দোকানে পেন্সিল কিনিতে গিয়াছিলেন। তিনি ঘোড়াটাকে ঐ ভাবে ছুটিতে দেখিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়া উহার ঘাড়ের চুল ধরিয়া ফেলেন, ঘোড়াটা আর পলাইতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই তাঁহার ন-মামার একটা আরবীয় ঘোটকীতে চড়িয়া অশ্বারোহণে সুদক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট বন্দুক ছোঁড়াও অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি সন্তরণে এইরূপ সুদক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, অনায়াসে সাঁতার কাটিয়া গড়ুই নদী পার হইয়া

যাইতেন। নৌকা চালনাতেও তিনি পটুতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার মধ্যম মাতুল হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া সেণ্ট্রাল কলেজে এফ্. এ. পড়িতে থাকেন। কিন্তু উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছায় এফ্. এ. পরীক্ষা না দিয়া সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং শিক্ষা করেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার ছোট মামা তাঁহাকে ক্ষেত্র গুহের কুস্তীর আখড়ায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। তথায় ব্যায়াম করিয়া যতীন্দ্রনাথ পুনরায় অটুট স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল লাভ করেন।

যতীন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং শিখিয়া এক ইংরেজী সওদাগরী অফিসে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে চাকরী আরম্ভ করেন। তৎপর মজঃফরপুরে যাইয়া তথাকার ব্যারিষ্টার কেনেডি সাহেবের ষ্টেনোগ্রাফার হন। তখন তাঁহার বেতন হয় মাসিক ৮০৲ টাকা।

ইহার পরই তিনি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চাকরী পান এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বদেশী রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়; তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। তখন হইতেই তিনি বিপ্লবপন্থীদিগের সহিত যোগদান করিয়া স্বদেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তিনি নিয়মিতভাবে গীতা পড়িতেন। অন্যান্য দেশের অভ্যুত্থানের ইতিহাসও তাঁহার পাঠ্য ছিল। বিপ্লবই যে দেশের একমাত্র মুক্তির পথ, এবিষয়ে তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল।

তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার নিজের বাসায় তরুণদিগকে গীতা পড়াইবার ক্লাস খুলিয়াছিলেন। তিনি গীতার মূল মন্ত্রে তরুণদিগকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিতেন। যাহাতে তাহারা প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বতোভাবে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, ইহাই ছিল তাঁহার প্রচেষ্টা। এইরূপে যতীন্দ্রনাথ একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। দলের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত ও তাঁহার উপদেশ মত চলিত।

এই সময়ে ১৯০৬ সালে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বাংলা গভর্ণমেণ্টের ষ্টেনোগ্রাফার রূপে কাজ করিবার সময় তাঁহাকে কলিকাতা ও দার্জ্জিলিং উভয় স্থানেই থাকিতে হইত।

১৯০৫ সালে বঙ্গবিচ্ছেদ ঘোষিত হয় এবং ১৯০৬ সালে বালগঙ্গাধর তিলক বাংলায় আসেন। তাঁহার বাংলায় আসার পর হইতেই এখানে বৎসর বৎসর শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ এই শিবাজী-উৎসবে যোগদান করিয়া বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। একবার শিবাজী উৎসব উপলক্ষে আলফ্রেড্ থিয়েটার গৃহে শিবাজীর তরবারিকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একখানি কোষমুক্ত তরবারিকে মঞ্চের উপর রাখিয়া তাহা কুসুম-সম্ভারে সজ্জিত করা হইয়াছিল। যাঁহারা দেশের মুক্তিকামী তাঁহারা যাহাতে এই তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেশের স্বাধীনতা প্রার্থনা করিতে পারেন তাহার জন্যই এই অনুষ্ঠানটি হইয়াছিল। কিন্তু পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবার ভয়ে অনেকেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথ

সে ভয়ে ভীত ছিলেন না, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় গমন করিয়া অসিতে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তথায় বাংলার তরুণদিগকে এই বলিয়া আহ্বান করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একমাত্র শক্তির উপরেই নির্ভর করে এবং এই তরবারিই সেই শক্তির প্রতীক। ভারত ও বঙ্গমাতার প্রত্যেক পুত্রেরই শক্তির পূজা করা উচিত।

যতীন্দ্রনাথ একবার দার্জ্জিলিং যাইবার পথে শিলিগুড়ি ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে এক গ্লাস জল লইয়া যাইতেছিলেন, তখন চারি জন গোরা সৈন্য পাশাপাশি যাইতেছিল। তাহারা আসিয়া যতীন্দ্রনাথকে অনর্থক ধাক্কা দেওয়ায় যতীন্দ্রনাথের হাতের গ্লাস পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ ইহা সহ্য করিলেন না। তিনি প্রতিবাদ করায় গোরা সৈন্য চারি জন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। যতীন্দ্রনাথও ভীত হইবার পাত্র নহেন, তিনিও শ্বেতাঙ্গ চতুষ্টয়কে প্রতি-আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষেই ঘুষাঘুষি ও মারামারি আরম্ভ হয়। সৈন্যদের একজন পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া যতীন্দ্রনাথকে আঘাত করে। তাহাতেও যতীন্দ্রনাথ পশ্চাৎপদ হন নাই। খালি হাতেই তিনি চারিজন গোরা সৈন্যকে মারিয়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে শায়িত করেন। গোরা সৈন্যেরা যতীন্দ্রনাথের নামে মামলা রুজু করে। কিন্তু সেই মামলা শেষ পর্য্যন্ত চলে নাই।

একবার কলিকাতায় এক শ্বেতাঙ্গের সহিত যতীন্দ্রনাথের বিবাদ বাঁধিয়াছিল। এক ফিরিওয়ালা চানাচুর লইয়া যাইতেছিল, একটি বালকের সহিত ধাক্কা লাগায় চানাচুরগুলি পড়িয়া যায়;

চানাচুরওয়ালা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছেলেটিকে ধরিয়া মারে ও টানা-টানি করিতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ তখন সেই পথে যাইতেছিলেন। তিনি চানাচুরওয়ালাকে পাঁচটি টাকা দিয়া বালকটিকে ছাড়িয়া দিতে বলেন কিন্তু সে ছাড়িয়া দিল না। ইহাতে চানাচুরওয়ালার সহিত যতীন্দ্রনাথের বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। তখন সেখান দিয়া একজন শ্বেতাঙ্গ যাইতেছিল, সে চানাচুরওয়ালার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যতীন্দ্রনাথকেই দোষারোপ করিতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ চানাচুরওয়ালার হাত হইতে বালকটিকে ছাড়াইয়া লন। ইহাতে সাহেব যতীন্দ্রনাথের উপর বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে যতীন্দ্রনাথ সাহেবকে উত্তম মধ্যম দিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ একবার কলিকাতা হইতে রাঁচি—প্রায় সত্তর মাইল পথ হাঁটিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পরোপকার-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি বহু দীনদুঃখী ও অসহায়কে অর্থ ও শারীরিক শক্তির দ্বারা সাহায্য করিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে তিনি বহু দান করিয়াছেন।

একবার যতীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ার খেয়াঘাট পার হইয়া কয়ায় যাইতেছিলেন। খেয়াঘাট হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা মুসলমান রমণী ঘাসের বোঝা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে অনেককেই বোঝাটি তাহার মাথায় তুলিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। যতীন্দ্রনাথ ঘাসের বোঝাটি বৃদ্ধার মাথায়

তুলিয়া দিতে যাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, উহা এত ভারী যে বৃদ্ধার পক্ষে তাহা বহিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। তখন যতীন্দ্রনাথ নিজেই সেই ঘাসের বোঝাটি মাথায় লইয়া একমাইল দূরস্থিত বৃদ্ধার গৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং তাহাকে কিছু অর্থসাহায্যও করিলেন। যতীন্দ্রনাথের হৃদয় ছিল বজ্রের মত কঠিন আবার কুসুমের মত কোমল।

কয়ার সন্নিকটস্থ এক গ্রামে বাঘের উপদ্রব হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার মামতো ভাই ফণিভূষণের সহিত ঐ বাঘ মারিতে গিয়াছিলেন। ফনিভূষণের হাতে ছিল বন্দুক আর যতীন্দ্রনাথ লইয়াছিলেন একটি ভোজালি। জঙ্গলে যেখানে বাঘ ছিল সকলে সেখানে গিয়া হাজির হইল। ঢিল ছুড়িয়া মারিতেই বাঘ বাহির হইয়া পড়িল। যতীন্দ্রনাথ সেই দিকেই দাঁড়াইয়াছিলেন। ফণিভূষণ গুলি করিলেন। গুলি বাঘের মাথার চামড়ায় সামান্য মাত্র লাগিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে বাঘ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যতীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিল। যতীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সাহসের সহিত বাঘের গলা চাপিয়া ধরিয়া ভোজালি দ্বারা উহার মাথায় আঘাত করিতে লাগিলেন। বাঘও যতীন্দ্রনাথকে কামড়াইতে লাগিল। যতীন্দ্রনাথ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। উভয়ের মধ্যে তখন রীতিমত লড়াই আরম্ভ হইল। বাঘ তাঁহাকে কামড়াইয়া ও আঁচড়াইয়া তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। যতীন্দ্রনাথ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া বাঘটাকে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিলেন। বাঘ মরিয়া গেল। যতীন্দ্রনাথও

অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার শরীরের ক্ষত সকল অত্যন্ত মারাত্মক হইয়াছিল। বিখ্যাত সার্জ্জেন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর চিকিৎসায় কিছুদিন পরে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

যতীন্দ্রনাথ হাওড়া ডাকাতি মামলার আসামী হইবার পর তাঁহার চাকরী যায়। তখন তিনি ঝিনাইদহে থাকিয়া কনট্রাকটরী করিতে আরম্ভ করেন। এই কাজের সময় একদিন গভীর রাত্রে তিনি অশ্বরোহণে বনের মধ্য দিয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন। কিছু দূর আসিয়া তাঁহার ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, সম্মুখে একটা বাঘিনী তিনটি বাচ্চা লইয়া শুইয়া আছে। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের কোট খুলিয়া ঘোড়ার চক্ষু ঢাকিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উহাকে বাঘের নিকট আগাইয়া লইয়া গেলেন এবং গুলি করিয়া উহার প্রাণ সংহার করিলেন। অতঃপর ঘোড়া হইতে নামিয়া বাঘের বাচ্চা তিনটিকে ধরিয়া ঝিনাইদহের বাসায় লইয়া আসিলেন। তিনি দুই দুই বার বাঘ মারিয়াছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে "বাঘা যতীন" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

এই সময় বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। পুলিশও ধরপাকড় আরম্ভ করিয়াছিল। যুগান্তর, সন্ধ্যা, স্বরাজ, নবশক্তি, কর্ম্মযোগিন প্রভৃতি কাগজগুলি অনলবর্ষী ভাষায় ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচার করিতে আরম্ভ

করিল। অরবিন্দ "ভবানীমন্দির" বই লিখিয়া বিপ্লবের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। গভর্ণমেণ্টের ধরপাকড় এবং অত্যাচারের ফলে দেশময় বিপ্লবাগ্নি আরও প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠিল। এই আন্দোলনে যতীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে মজঃফরপুরে প্রফুল্ল-চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু কর্ত্তৃক মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তাহাতে ভুলক্রমে মিসেস ও মিস্ কেনেডী নাম্নী দুইটি ইংরেজ মহিলা নিহত হন। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়িয়া আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। এই ঘটনার পরেই পুলিসের টনক বিশেষভাবে নড়িয়া উঠে। তদনুসারে ১৯০৮ সালের ২রা মে তারিখে পুলিস কর্ত্তৃক বিপ্লবীদিগের আশ্রম ও কর্ম্মকেন্দ্র মুরারীপুকুরের বাগান-বাড়ী পরিবেষ্টিত হয়। ফলে বোমা, বোমা প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি, বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, কার্ত্তুজ, বারুদ ও কাগজপত্র পুলিসের হস্তগত হয় এবং অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাস কর; উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি বহু বিপ্লবী পুলিসের হস্তে ধৃত হন। ইহা হইতেই আলিপুর বোমার মামলার উদ্ভব। বিচারে অনেকের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও দীর্ঘমেয়াদে কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ ধরা পড়েন নাই। তিনিই তখন পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লব আন্দোলন জীবন্ত রাখিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিপুর বোমার মামলার সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাসকে আদালতের মধ্যেই গুলি করিয়া

হত্যা করা হয়। এই সময় হইতেই সি-আই-ডি পুলিশ যতীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করে। ১৯১০ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টে আলিপুর বোমার মামলার তদ্বিরকারী সি-আই-ডি সামস্থল আলমকে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামক আঠারো বৎসর বয়সের একটি বালক গুলি করিয়া হত্যা করেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ধৃত হন। তাঁহার স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ যে, যতীন্দ্রনাথই তাঁহাকে এই হত্যার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই স্বীকারোক্তির ফলেই পুলিস যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে। চারিদিন লাল বাজারের লক-আপে রাখিয়া পরে তাঁহাকে হাওড়া জেলখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

যতীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে হরিদ্বারে যাইয়া ভোলাগিরির নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। ভোলাগিরি তাঁহাকে একটি মন্ত্রপূত রুদ্রাক্ষ দিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাহা গলায় পরিয়া থাকিতেন। যতীন্দ্রনাথকে হাওড়া জেলে ঢুকাইবার সময় জেলার জেদ ধরিলেন, ঐ রুদ্রাক্ষটি খুলিয়া রাখিয়া জেলে ঢুকিতে হইবে। যতীন্দ্রনাথও রুদ্রাক্ষ খুলিবেন না, ইহা লইয়া জেলারের সঙ্গে তাঁহার তীব্র বাদানুবাদ চলে। জেলারের হুকুমে সিপাহীরা জোর পূর্ব্বক উহা খুলিয়া লইতে উদ্যত হইলে যতীন্দ্রনাথ অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "যদি ভাল চাও, আমাকে কেহ স্পর্শ করিও না। জোর করিয়া আমার সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমার প্রাণ থাকিতে গলার রুদ্রাক্ষ খুলিতে দিব না।" জেলার গত্যন্তর না দেখিয়া অবশেষে

রুদ্রাক্ষ লইয়াই তাঁহাকে জেলের মধ্যে যাইতে অনুমতি দিলেন।

যতীন্দ্রনাথের সহিত এক সঙ্গে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে "হাওড়া ষড়যন্ত্রের মামলা" নামে একটি বড় রকমের মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যার পর যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপরেও জেলে ভয়ানক কড়াকড়ি আরম্ভ হয়। এই মামলা পরে ফাঁসিয়া যায় এবং সকল আসামীই মুক্তিলাভ করে।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হইতে মুক্তি পাইয়া যতীন্দ্রনাথ কনট্রাকটরী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সরকার হইতে গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার পর কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু হত্যাকাণ্ড এবং ডাকাতি সংঘটিত হয়, ইহার অনেকগুলির সহিতই যতীন্দ্রনাথের সংশ্রব ছিল বলিয়া প্রকাশ।

১৯১৪ সালে ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হইলে জার্ম্মানীতে যে সকল ভারতীয় ও বাঙ্গালী বিপ্লবী ছিলেন তাঁহারা ভারতে বিদ্রোহ করিবার জন্য জার্ম্মানী হইতে এদেশে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাংলার বিপ্লবিগণ জার্ম্মানীর সহায়তায় এদেশে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়া ১৯১৫ সালের প্রথমেই ভারতব্যাপী একটা বড় রকমের বিদ্রোহ করিবার সঙ্কল্প করেন। বাংলার বিপ্লবীদের সকলেই একত্র হইয়া যতীন্দ্রনাথকেই এই বিপ্লবের নেতৃত্বে বরণ করেন। এখন হইতেই সমগ্র বাংলার বিপ্লব নেতারূপে যতীন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইলেন। বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনাইতে বহু অর্থের প্রয়োজন বলিয়া যতীন্দ্রনাথকে স্বদেশী ডাকাতিতে লিপ্ত হইতে হয়। গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটায় ডাকাতি করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

জার্ম্মাণদিগের সহিত অস্ত্রশস্ত্র আনাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে ব্যাঙ্ককে ও ব্যাটাভিয়ায় পাঠাইয়া দেন।

নরেন্দ্রনাথ 'মেভারিক' নামক জাহাজে বহু অস্ত্রশস্ত্র বাংলায় আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। স্থির হয় যে, ঐ জাহাজ রায়মঙ্গল নামক স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া দিবে। যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঐ মাল কোথায় লইয়া যাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মেভারিকের অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া তাহার কতক বরিশালের অন্তর্গত হাতিয়ায়, কতক কলিকাতায় এবং কতক বালেশ্বরে পাঠান স্থির হয়।

যাহাতে অন্যস্থান হইতে বাংলায় ইংরাজসৈন্য আমদানী করা না যায় সেজন্য বাংলায় আসিবার রেললাইনের প্রধান প্রধান সেতুগুলি উড়াইয়া দিয়া তিনটি রেলওয়ে লাইন আগলাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থামত স্থির হইল যে, যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে থাকিয়া মাদ্রাজ রেললাইনের ভার লইবেন। তদনুসারে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে চলিয়া যান।

মেভারিক জাহাজে বহু অস্ত্রশস্ত্র আসিতেছে, গভর্ণমেণ্ট

তাহা টের পাওয়ায় উহা আর আসিয়া পৌছিল না। সুতরাং বিদ্রোহ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

বেলিয়াঘাটার মোটর-ডাকাতির পর যতীন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সি-আই-ডি বিভাগীয় একজন বড় পুলিস কর্ম্মচারীকে হত্যা না করিয়া জল স্পর্শ করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞানুযায়ী যতীন্দ্রনাথ বেলা ১০টার সময় সি-আই-ডি কর্ম্মচারীর খোঁজে বাহির হন। অপরাহ্ণে কলিকাতা হেদুয়ার নিকটবর্ত্তী রাস্তার উপরে সি-আই-ডি বিভাগীয় একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার উপর উপর্য্যুপরি তিনবার রিভলবারের গুলি করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। এই হত্যার পর যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন সঙ্গীসহ পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতে থাকেন।

ব্রিটিশ সরকার যতীন্দ্রনাথকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা যতীন্দ্রনাথের একটি ফটো ও পুরস্কার সহ বৃহৎ অক্ষরে প্যাম্পলেট মুদ্রিত করিয়া কলিকাতার প্রত্যেক অলিতে গলিতে স্তম্ভে স্তম্ভে টাঙ্গাইয়া দেন, কিন্তু তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

যখন যতীন্দ্রনাথ পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন নীরদ হালদার নামক একজন গোয়েন্দা হঠাৎ সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করে। ঐ ব্যক্তি তখনই রিভলবারের গুলিতে নিহত হয়। ইহার পরেই যতীন্দ্রনাথ সঙ্গিগণ সহ বালেশ্বরে চলিয়া যান।

যতীন্দ্রনাথ ও তাহার সঙ্গীরা নিরাপদে বাস করিয়া চাষী-দিগের সহিত জমি চাষ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। পুলিস কিন্তু মার্চ্চ মাসের শেষেই সংবাদ পাইয়াছিল যে, যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের কোনও স্থানে গোপনে বাস করিতেছেন। পুলিস ময়ূরভঞ্জের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের মধ্যে ও জঙ্গলে যতীন্দ্র-নাথের সন্ধান করিতে থাকে।

যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর হইতে কুড়ি মাইল দূরে কোপতি পোদার জঙ্গলে সঙ্গিগণসহ আশ্রয় লইয়াছিলেন। পুলিস এই সংবাদ পাইয়া ঐ জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে ঘিরিয়া ফেলিল। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ পলায়ন করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তখন তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে জ্যোতিষ পাল খুব অসুস্থ হইয়া পড়ায় ও চলিতে অক্ষম হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ ঐ স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিলেন না। জঙ্গলের মধ্যেই খাদ-কাটা অপর একটি স্থানে যাইয়া তাঁহারা আশ্রয় লইলেন।

কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেব ও বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যদল সহ ঐস্থানে যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে আক্রমণ করিলেন। বিপ্লবিগণ দূর হইতে পুলিস ও সৈনিকদলের শিরস্ত্রাণ, রাইফেল ও সঙ্গীনের সারি দেখিয়া তাঁহাদের আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশ রাঙাইয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন, তাঁহার রক্তরশ্মি-

লেখা বুড়ীবালামের জলে পড়িয়া তাহা রাঙাইয়া তুলিয়াছে। পুলিস-বাহিনী বিপ্লবীদের নিকটবর্ত্তী হইলে পুলিস কমিশনার মনে করিলেন, এই পাঁচজন বিপ্লবী অতগুলি পুলিস দেখিয়া অনায়াসেই আত্মসমর্পণ করিবেন। এই সময়ে হঠাৎ একটি গুলি তাঁহার কানের পাশ দিয়া শো করিয়া চলিয়া গেল। গুলি করিলেন যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তখন পুলিস কমিশনার আদেশ দিলেন,—গুলি চালাও। পরমূহূর্ত্তেই অবিরাম গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইল। বিপ্লবীরাও চুপ করিয়া রহিলেন না। তাঁহারাও সমভাবে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ভূপৃষ্ঠস্থ গর্ত্তকে ট্রেঞ্চরূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহারা পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এই পঞ্চবীরের অক্লান্ত গুলিবর্ষণের ফলে পুলিস-বাহিনীকে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল।

এই উভয় পক্ষের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের ফলে পুলিস-বাহিনী-নিক্ষিপ্ত একটি গুলি আসিয়া চিত্তপ্রিয়ের বক্ষ বিদ্ধ করিল। চিত্তপ্রিয় মৃত্যুযন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া বীরদর্পে কহিলেন,—দাদাকে বাঁচাও, প্রাণপণে যুদ্ধ কর। সেই স্থানে চিত্তপ্রিয়ের জীবনের অবসান হইল। তিনি হাসিমুখে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

চিত্তপ্রিয়ের মৃত্যুতে অবশিষ্ট বীর চতুষ্টয়ের ধমনী শোণিত আরও উষ্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়াও বীরবিক্রমে অবিশ্রান্ত গুলি চালাইতে লাগিলেন। পুলিস-বাহিনী পশ্চাতে হটিতে লাগিল। চিত্তপ্রিয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বেই একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্রনাথের উরুতে লাগিয়াছিল।

আহত হইয়াও যতীন্দ্রনাথ গুলি চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে একটি গুলি আসিয়া তাঁহার পেটে বিদ্ধ হইল। তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। যদি যতীন্দ্রনাথকে চিকিৎসা দ্বারা বাঁচান যায় এই আশায় মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ গুলি বর্ষণ বন্ধ করিয়া উত্তরীয় উড়াইয়া সন্ধি ঘোষণা করিলেন। সন্ধি মঞ্জুর হইল।

বিপ্লবীত্রয় বন্দী হইলেন। যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বর হাসপাতালে লইয়া গিয়া ভর্ত্তি করা হইল। কয়েকদিন পরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। যতীন্দ্রনাথ হাসপাতালে যাইবার পর তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পান করিতে চাহিলে টেগার্ট সাহেব একগ্লাস জল লইয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমি যাহার রক্ত দেখিতে চাহিয়াছিলাম তাহার দেওয়া জলে আমি তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চাহিনা।"

টেগার্ট যতীন্দ্রনাথের উপর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়কে বলিয়াছিলেন,—"I had to do my duties, but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench."—অর্থাৎ আমাকে আমার কর্ত্তব্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছেন।

নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ এই তিন জনের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠনের জন্য মামলা রুজু করা হয়। বিচারে নীরেন

ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয়; জ্যোতিষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। আন্দামানে জেলের অত্যাচারে ও পরিশ্রমে তিনি পাগল হইয়া যান। অবশেষে রংপুর জেলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথকে বিদেশী শাসক রাজদ্রোহী ও অপরাধী বলিয়া কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত করিলেও দেশবাসী তাঁহাকে চিরকাল শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে এবং দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি মরিয়াও দেশবাসীর হৃদয়ে অমর হইয়া থাকিবেন।

বুড়ী বালামের তীরে

—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

'বুড়ী বালামের' তীরে
বুকের শোণিতে যে দিন তোমরা রাঙালে ধরিত্রীরে,
সম্মুখে-রণে যুঝি প্রাণপণে ঘুমালে বীরের দল—
মৃত্যু সেদিন জ্বালালো শ্মশানে মুক্তির হোমানল।
নিজেরে সে দিন নিঃশেষ ক'রে বিলায়ে গেলে যে আলো
সেই আলোকের রক্ত-শিখায় মিলায় রাতের কালো—
সেই দিনের সেই মৃত্যুর দান সকল দৈন্য হরি'
নব জীবনের গরিমায় মরু তুলিছে শ্যামল করি'।

* * *

আজি তোমাদের স্মরি
নবীন আশার কনক কিরণে উঠিছে চিত্ত ভরি'।

সারা তনু-মন ঝঙ্কার দিয়া গাহিতেছে অনুখন—
'বাঘা যতীন্দ্র'—ছিল সে বাঙালী, ছিল 'মনোরঞ্জন'
'চিত্ত', 'নীরেন' বাঙালীর ছেলে! এই আকাশেরই তলে
প্রাণ তাহাদের উঠিল বিকশি' হাসি ও অশ্রুজলে।

কে বলে এ দেশের মানুষ কেবল কল্প-কুঞ্জবাসী?
'মোহনলালের' অসির সঙ্গে 'চণ্ডীদাসের' বাঁশী।
মিশেছে এ দেশে, খোলের সঙ্গে শাক্তের ঢাক,—
কোকিল-ডাকের সঙ্গে হেথায় গর্জ্জে বাঘের ডাক,—
'কপোতাক্ষীর' সঙ্গে ছুটেছে ভীষণ 'পদ্মা' নাচি,—
ভোমরার সাথে বাঁধিয়াছে বাসা পাহাড়িয়া মৌমাছি,
বেনু-রাগিণীর সঙ্গে নাগিণী ফণা নাচাইয়া খেলে,—
শ্যামল ধরার বুক চিরে নীল পাহাড় উঠেছে ঠেলে,—
কোমলে কঠিনে মেশান এ মাটি,—তরুণেরা এই দেশে
বটের ছায়ায় বাঁশরী বাজায়, ফাঁসিকাঠে মরে হেসে।

* * *

বিজয়ী বীরের দল :—
তোমরা মরিয়া শিখাইয়া গেলে বাঁচিবার কৌশল।
দেখালে দেশের মুক্তির পথ মৃত্যুর বুক দিয়া ;—
এর চেয়ে কোন সোজা পথ নাই,—লাটের সভায় গিয়া
গরম গরম কথায় মূর্খ-জনতা ভোলানো যায়—
মুক্তি—সে বড় নির্ম্মম প্রাণ,—সব কিছু সে চায়!

অযুত বীরের রক্তে তাহার রঙীন চরণ-তল,—
পদ যুগ ঘিরি অশ্রু-সাগর করিতেছে টলমল।
তার দেখা মেলে ফাঁসির মঞ্চে, নীরন্ধ্র কারাগারে,—
আপন বলিতে কিছুই যখন থাকেনা তখন দ্বারে
নীরব চরণে সে আজি দাঁড়ায় ; মৃত্যুর সম্মুখে
কোথা হ'তে এসে চুপি চুপি হেসে চুম্বন দেয় মুখে।
সে চায় প্রাণের সকল সফল দরদ, সবটুকু ভালবাসা,—
তারে যে চেয়েছে প্রাণ মন দিয়ে ভেঙ্গেছে তাহার বাসা !
ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া হয়েছে সে পথচারী,—
কুলে কালি দিয়ে অকূল সাগরে দিয়েছে সেজন পাড়ি।

* * *

জ্বালালে যে হোমানল—
শতশিখা মেলি পরশিবে তাহা মহা-অম্বর-তল !
কুটীরে কুটীরে ছড়াবে আগুন ;—সাঁজের আকাশ-তলে
তোমাদের কথা জননী শিশুরে কহিবে অশ্রুজলে !
পিতা শুনাইবে পুত্রেরে তার,—ভ্রাতা ছোট ভগিনীরে—
কেমন করিয়া মরিলে তোমরা 'বুড়ী বালামের' তীরে।
সেই মরণের অমর কাহিনী ছন্দে রচিবে কবি,—
শিল্পী ফুটাবে চিত্রে বীরের শেষ বিদায়ের ছবি,
চারণ গাহিবে পথে পথে সেই মৃত্যুর জয়গান,—
সে গান শুনিয়া বক্ষে বক্ষে জাগিবে তরুণ প্রাণ।
'প্রতাপ' 'মোহন' 'সীতারাম' আর 'মীরমদনের' পাশে
রক্ত আখরে তোমাদের কথা লেখা রবে ইতিহাসে।

শহীদ যতীন দাস



মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে প্রাচীন পন্থীরা সায় দিলেও বাংলার তরুণ দলের অনেকেই সায় দিতে পারিল না। তাহারা সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদকেই দেশের একমাত্র স্বাধীনতার পথ মনে করিয়া তাহাই তাহাদের জীবনের কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। এই ব্যাপক বিপ্লব আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল সমগ্র বাংলায়,—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে। পূর্ব্ববঙ্গের যুবকেরাই বিশেষ করিয়া এই বিপ্লব-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। গান্ধীজির নির্ব্বিরোধ ভাবকে তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। চৌরিচৌরার ঘটনার পর ইহারা গান্ধীজির আদর্শকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গুপ্ত সংগঠন ও সন্ত্রাসবাদের পথে পদবিক্ষেপ করে। পরিপূর্ণ বিস্তৃত সংগঠন এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক বীর্য্য বিকাশের চেষ্টা ছিল ইহাদের জীবনে এই তরুণ কর্ম্মীদলের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ দাস ছিলেন একজন।

সরকারের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ জেলের মধ্যে অনশন করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়ার দৃষ্টান্ত তিনিই এদেশে প্রথম প্রচার করেন। মৃত্যুর এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসেও অত্যন্ত বিরল। ইহার পূর্ব্ব আয়র্লণ্ডের বিপ্লবীদলের টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনি নামক একজন যুবক ২৩ দিন অনশন করিয়া কারাগারে মৃত্যুপথের যাত্রী হন। পরে যতীন্দ্রনাথ দাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও কয়েকজন যুবক মৃত্যুকে বরণ করিয়া লন। ইহাদের মধ্যে মানিকলাল সেন একজন। তিনি ১৯৩০ সালে বারাণসী জেলে ৯০ দিন অনশন করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন।

যতীন্দ্রনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন। এই পঁচিশ বৎসর জীবনে তিনি দেশের জন্য বহু দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া গিয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সঙ্গতিবান্ পিতার পুত্র। তাঁহার পিতার নাম বঙ্কিমবিহারী দাস। শৈশব হইতেই তাঁহার শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। ষোল বৎসর বয়সে তিনি ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময় গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। যতীন্দ্র-[illegible]র অন্তর দেশের ডাকে সাড়া দিয়া দিয়া উঠে, ১৯২০ [illegible]র শেষভাগে তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয়া অসহযোগ [illegible]ন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া

দেশের কাজ করিতে থাকেন, এই জন্য নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৯২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে বন্যা হয় তাহাতে যতীন্দ্রনাথ অক্লান্তভাবে বন্যাপীড়িতদিগের দুঃখ মোচনে পরিশ্রম করেন। কর্ম্মে তাঁহার ছিল অসীম অনুরাগ। তিনি যে কার্য্যই গ্রহণ করিতেন, তাহা সম্পাদন করিতে অকুণ্ঠ পরিশ্রম করিতেন।

ইহার পরই যতীন্দ্রনাথকে দুইবার জেলে যাইতে হয়। প্রথমবার তাঁহার জেল হয় একমাসের, পরের বার তিনি জেল ভোগ করেন তিন মাস।

জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি দেখেন, দেশে অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা পড়িয়াছে,—এমন কি, থামিয়াই গিয়াছে। বাংলার প্রধান প্রধান প্রবীন কর্ম্মীদের সহিত তরুণ দলের মতের মিল হইতেছে না। তরুণেরা তাই নূতন পথের সন্ধান করিতেছে। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে পুনরায় কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আই. এ. পড়িতে থাকেন এবং যথা সময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই সময়ে ১৯২৪ সালে দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ম্মিদলের মধ্যে সংগঠন ভাব বিস্তৃত করা এবং উপযুক্ত নূতন কর্মী সংগ্রহ করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন এই তরুণ সমিতির উদ্যোক্তা-দিগের অন্যতম। এই সময় তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন ইহার সহকারী সম্পাদক।

এদিকে সরকারের রুদ্র দৃষ্টি বাংলার তরুণপন্থীদিগের উপর অত্যন্ত তীব্র ভাবে পতিত হয়। জরুরী আইনের কবলে পড়িয়া প্রায় সকলেই পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। যতীন্দ্রনাথকেও এই সময় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে কিছুদিন প্রেসিডেন্সী জেলে রাখিয়া তৎপরে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে যতীন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। ঢাকা জেলে আবদ্ধ থাকাকালে যতীন্দ্রনাথ প্রথম দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় প্রদান করেন।

জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদিন যতীন্দ্রনাথকে অন্যায় গালাগালি করেন। যতীন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদ করিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার নামে জেলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করেন। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যতীন্দ্রনাথ অনশন আরম্ভ করেন। অনেক অনুরোধ এবং ভয় দেখাইয়াও যখন তাঁহাকে অনশন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা গেলনা, তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাধ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করিলেন এবং নিজের অন্যায় ব্যবহারের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। ২৩ দিন পরে যতীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গ করেন।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এমন একটি লোককে আর তাঁহার অধীনে সেখানে রাখা সঙ্গত মনে করিলেন না। তখন তাঁহাকে পাঠান হইল পাঞ্জাবের অন্তর্গত মিয়ান্‌ওয়ালী জেলে। পাঞ্জাবে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে চট্টগ্রামের একটি পল্লীগ্রামে তাঁহাকে অন্তরীণ অবস্থায়

রাখা হয়। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগ্রহের কার্য্যে যতীন্দ্রনাথ আত্মনিয়োগ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে তিনি বি. এ. পড়ার জন্য বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই ১৯২৯ সালের জুন মাসে তাঁহাকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

পাঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে একটি বিপ্লবী কর্ম্মিদল ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত ছিল ইহাদের কর্ম্মভূমি। কয়েকজন বাঙ্গালী যুবকও এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন। এই দল "সোশ্যাল রিপাব্লিকান আর্ম্মি" নামে একটি দল গঠন করেন। এই দলের কমলনয়ন তেওয়ারী নামে এক যুবক কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার বাসায় উত্তর ভারতের কয়েকজন কর্ম্মী বোমা প্রস্তুত করিতে থাকেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন। এই ব্যাপার লইয়াই পুলিসের গুপ্তচর বিভাগ যতীন্দ্রনাথের সংবাদ পায় এবং এই সংশ্রবেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

রিপাব্লিকান আর্ম্মির দুইজন কর্ম্মী—ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইন-সভায় বোমা নিক্ষেপ করিতে গিয়া ধরা পড়েন। ইহার ফলে ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী আরম্ভ

হয়, ইহা হইতেই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার উৎপত্তি। এই মামলায় সর্ব্বসমেত ২৩ জন আসামী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ অন্যতম।

বিচারের পূর্ব্বে এই আসামীদিগকে দীর্ঘকাল হাজতে আটক রাখা হয় এবং স্বীকারোক্তি করাইবার জন্য ইহাদের উপর কঠোর অত্যাচার ও নির্য্যাতন চালান হয়। সাধারণ অপরাধীদিগের অপেক্ষাও অধিকতর জঘন্য ব্যবহার করা হয় ইহাদের উপর। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯২৯ সালের ২৩শে জুলাই এগার জন আসামী অনশন আরম্ভ করেন। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে একজন।

এই অনশনব্রতীরা যে কেবল তাঁহাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাইলেন, তাহা নহে। যাহাতে সমগ্র ভারতের রাজনীতিক আসামীদের প্রতি সাধারণ কয়েদীদের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ব্যবহার করা হয়, সেইজন্যই এই প্রতিবাদ।

রাজনীতিক বন্দীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহারা দাবী জানাইলেন :—

(১) রাজনীতিক বন্দীদিগকে পৃথক শ্রেণীতে রাখিতে হইবে।

(২) তাঁহাদের দ্বারা সাধারণ শ্রমের কাজ, যেমন পাথর ভাঙ্গা, ঘানি চালান ইত্যাদি করা চলিবে না।

(৩) তাঁহাদের জন্য উৎকৃষ্টতর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) তাঁহাদিগকে পড়াশুনার সুযোগ দিতে হইবে, এবং প্রত্যহ একখানি সংবাদপত্র তাঁহাদের চাই।

(৫) তাঁহাদিগকে ভদ্রজনোচিত পোষাক পরিচ্ছদ দিতে হইবে।

কিন্তু সরকার এই দাবীর কোনটিই গ্রাহ্য না করায় অনশনব্রতীরা তাঁহাদিগের অনশন চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

অনশন আরম্ভ করার কয়েকদিন পরেই যতীন্দ্রনাথের শরীর বিশেষ রকম দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল জেলের একটি নির্জ্জনকক্ষে। অনশনের ফলে তাঁহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ বলপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে আহার করাইবার চেষ্টা করেন, তাহাতে অনেকের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে। যতীন্দ্রনাথের নাক দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে; কাজেই তখন তাঁহাকে জেল-হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময়ে একদিন জোর করিয়া খাওয়াইবার সময় যতীন্দ্রনাথ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহার দেহ ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইতে থাকে।

অনশনের ত্রয়োদশ দিবসে চিকিৎসক যতীন্দ্রনাথের দেহ পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন এবং জোর করিয়া খাওয়ান বন্ধ করিবার আদেশ দেন।

যতীন্দ্রনাথের অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতাকে হাসপাতালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু বাহির হইতে কোনও ডাক্তার আনাইবার অনুমতি দেওয়া হয় না। এই সময়েও যতীন্দ্রনাথের

আত্মিক বল অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি, অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া ঔষধ পর্য্যন্ত তাঁহাকে খাওয়াইতে পারা যায় নাই। অচৈতন্য অবস্থায়ও তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অবশেষে ৬২ দিন অনশনের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় এই মরণ-বিজয়ী বীর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বের কয়েকদিন তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার মৃতদেহ লাহোর হইতে কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। সুদীর্ঘ পথের প্রত্যেকটি ষ্টেশনে এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইবার জন্য বিপুল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল।

১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার রাত্রে যতীন্দ্রনাথের শবদেহ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছে। রাত্রে উহা হাওড়া টাউন হলে পুষ্পশয্যায় অতীব যত্নে রক্ষিত হয়।

পরদিন সকাল সাড়ে ছয়টায় শোভাযাত্রা সহকারে যতীন্দ্রনাথের দেহ কেওড়াতলা শ্মশানে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভোর হইতেই দলে দলে লোক হাওড়া টাউন হলে সমবেত হইতে থাকে। যতীন্দ্রনাথের শবদেহের শোভাযাত্রা হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, সুরেন ব্যানার্জ্জী রোড প্রভৃতি পথ দিয়া বেলা দুইটার সময় কেওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত হয়। তখন কলিকাতার পথে, বাড়ীর বারান্দায়, জানালায় এতলোক সমাগম হইয়াছিল যে, তিল ধারণের স্থান ছিল না।

যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিতায় অগ্নি সংযোগ করেন।

চিতা নির্ব্বাপণের পর চিতা-ভস্ম লইবার জন্য সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু এক পরম গৌরবের অভিনব মৃত্যু। এই মৃত্যু দ্বারা তিনি দেশের তরুণ বিপ্লবীদিগকে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়া যান। কিরূপে আত্মবলে বলীয়ান হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে হয় যতীন্দ্রনাথ তাহার চরম নিদর্শন।

শহীদ বিনয় বসু



১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে আইন-অমান্য আন্দোলন নীতি পরিগৃহীত হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে সারা দেশ এই কাজ আরম্ভ করে। এই বৎসরটি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই আন্দোলনে দেশের তরুণ বিপ্লবীদলের ততটা সায় ছিল না, যতটা সায় ছিল তাঁহাদের বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের দিকে। তাঁহারা গান্ধীজির অহিংস গণ-আন্দোলনকে আবরণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট সাধনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের প্রধান কর্ম্মভূমি ছিল পূর্ব্ববঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গের যুবকেরাই বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঢাকা এবং বিক্রমপুর অঞ্চলই ছিল এই বিপ্লব প্রচেষ্টার কেন্দ্র-ক্ষেত্র। তরুণ বিপ্লবীরা এই সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—একটি যুগান্তরের দল ও অপরটি

অনুশীলন সমিতির দল। এই দুই দলে মতের পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার অভাব ছিল না। বিনয় বসু ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির অন্যতম সদস্য।

বিনয় বসুর পৈত্রিক বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাউতভোগ গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম রেবতী মোহন বসু। তিনি সপরিবারে তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়কৃষ্ণের কর্ম্মস্থল জেমসেদপুরে বাস করিতেছিলেন। বিনয় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। শৈশব হইতেই বিনয়ের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। অমায়িক মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র। ১৯৩০ সালে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ এক ছাত্রাবাসে বাস করিতেন।

১৯৩০ সাল। সরকারের গুপ্তবাহিনীর অধিনায়করূপে টেগার্ট সাহেব আবার এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গুপ্ত ষড়যন্ত্র-কারীদের মধ্যে তাঁহাকে হত্যা করিবার চক্রান্ত গড়িয়া উঠে। ২৫শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা লালদীঘির ধারে টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতে অনুজাচরণ সেন নামে একজন বিপ্লবী ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং বসির-হাটের দীনেশ মজুমদার আহত অবস্থায় পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। টেগার্ট সাহেব রক্ষা পাইয়া যান। এই ব্যাপারে চারিদিকে পুলিস কর্ত্তৃক ধরপাকড় সুরু হইয়া যায়।

২৯শে আগষ্ট বাংলা পুলিসের ইনস্পেক্টার জেনারেল

লোম্যান এবং ঢাকার পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হড্সন সাহেব মিটফোর্ড হাসপাতাল পরিদর্শনে গমন করেন। বিনয় বস্থ তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য দুইটি রিভলবার লইয়া হাসপাতালে গমন করেন। সকালবেলা লোম্যান এবং হড্সন হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় বিনয় বস্থ আগাইয়া আসিয়া লোম্যান সাহেবকে গুলি করেন। তাঁহার অভেদ্য লক্ষ্যের ফলে গুলি লোম্যান সাহেবের তলপেট বিদ্ধ করে এবং তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়েন। হড্সন সাহেব পিছন ফিরিয়া দেখিতে যাইবেন এমন সময় বিনয় বস্থর নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয়গুলি তাঁহার শরীর বিদ্ধ করে। তিনিও মাটিতে পড়িয়া যান। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে তখন অনেক লোক জমা হইয়াছিল, তাহাদের একজন দৌড়াইয়া গিয়া বিনয় বস্থকে ধরিয়া ফেলে। বিনয় বস্থর শরীরে তখন আস্থরিক বলের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি এক ঝটকায় মুক্তি লাভ করিয়া পলাইয়া যান। পলাইবার সময় তাঁহার একটি রিভলবার ও চটি জুতা তথায় ফেলিয়া আসেন।

পরে পুলিশ এই চটির মালিকের সন্ধান করিতে যাইয়া জানিতে পারে যে, আক্রমণকারী বিনয় বস্থ। এই ঘটনার পর পুলিশ সমস্ত মেডিক্যাল স্কুল এবং ছাত্রাবাস তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করে। এই খানাতল্লাসী এমন ভয়ানক ভাবে হইয়াছিল যে, ৫১ জন ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আশ্রয় লইতে হয়।

এই ঘটনার দুইদিন পরেই লোম্যান সাহেব হাসপাতালে

মারা যান এবং হড্‌সন সাহেব আরোগ্য লাভ করিয়া উঠেন। বিনয় বসুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশ ঢাকা শহরে এবং আশেপাশে ভয়ানক চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু বিনয় বসু তখন ঢাকা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

বিনয় বসু প্রায় তিন মাস বহু কষ্ট সহ্য করিয়া নানাস্থানে অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহাকে বহুবার ছদ্ম পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়।

ডিসেম্বর মাসের পয়লা তারিখে বিনয় বসু আরও দুইটি সঙ্গীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই দুইটি সঙ্গীর নাম সুধীর গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত। সুধীর গুপ্ত ঢাকা জেলার শিমূলিয়া গ্রামের অবনীমোহন গুপ্তের পুত্র। দীনেশ গুপ্তের পিতা সতীশচন্দ্র গুপ্ত ময়মনসিংহের জামালপুরে কাজ করিতেন। ইহারা উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যার সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে এই তিন জন যুবক রাইটার্স বিল্ডিংএ দুপুর বেলায় কারা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে। দ্বারোয়ান কার্ড চাহিল, কিন্তু তাহারা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল মিঃ সিম্পসন টেবিলে বসিয়া লিখিতেছিলেন, তাঁহার সহকারী সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন। যুবক তিন জন ঘরে ঢুকিয়া অনবরত রিভলবার হইতে গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। চারিটি গুলি সিম্পসনের শরীর বিদ্ধ করিল। ঘটনা স্থলেই

তিনি মারা গেলেন। সহকারীটি ভয়ে পলাইয়া গেলেন। যুবক তিনটি গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বারান্দা দিয়া চলিয়া যাইতে থাকেন।

দোতালার ঘরের পূর্ব্বদিকে আসিয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন আর পলাইবার পথ নাই। পলাইতে গেলেই তাঁহারা ধরা পড়িবেন, তখন তাঁহারা আত্মহত্যা করাই স্থির করিলেন। সুধীর গুপ্ত পটাসিয়াম সায়নাইড সেবন করিয়া সেখানেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। বিনয় বসু এবং দীনেশ গুপ্ত নিজেদের রিভলবার দিয়া নিজেদের শরীরে গুলি করিলেন। এই গুলিতে বিনয় বসুর মাথার খুলিতে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁহার মস্তিষ্কের মগজ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছিল। ফলে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চারিদিন তথায় থাকার পর ১৩ই ডিসেম্বর সকাল বেলায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

দীনেশ গুপ্তও গুরুতর রূপে আহত হন। দুইবার অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করা হয়। অবশেষে ফাঁসীর মঞ্চে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়।

শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার



বৈপ্লবিক আন্দোলনে মেয়েরাও যোগদান করিয়া যে এই আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রীতিলতা। প্রথম প্রথম মেয়েদিগকে বৈপ্লবিক আন্দোলনে গ্রহণ করা হইত না। পরে ইহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া মেয়েদিগকেও এই কার্য্যে টানিয়া লওয়া হয়। উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে মেয়েরাও যে দুঃসাহসে ও আত্মত্যাগে পুরুষদের অপেক্ষা কম যান না, এ কথা ক্রমশঃ নেতাদিগের হৃদয়ে বদ্ধ মূল হইতে থাকে।

চট্টগ্রাম গুপ্তসমিতির অধিনায়ক ও নেতা সূর্য্য সেন প্রথমতঃ মেয়েদিগকে দলে নিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে জেল হইতে বাহির হইয়া যখন তিনি গুপ্ত-সমিতিগুলিকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন, তখন অনেকে মেয়েদিগকে তাহাতে গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন তখনও এই বিষয়ে তিনি দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন, পরে অবশ্য

এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং তিনি কয়েকটি মেয়েকে তাঁহার দলে গ্রহণ করেন।

১৯২৮ বা ১৯২৯ সালে কয়েকটি মেয়ে চট্টগ্রাম গুপ্ত বিপ্লব প্রচেষ্টার সহিত যোগ দেওয়ার সুযোগ পান। ইঁহারা সকলেই ছিলেন স্কুলের ছাত্রী। ইঁহাদের মধ্যে প্রীতিলতার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। চরিত্রের দৃঢ়তায়, কর্ম্মনিষ্ঠায়, সাহসিকতায় ও আত্মত্যাগে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী ছেলেদের মধ্যেও ছিল দুর্ল্লভ।

প্রীতিলতা জন্মিয়াছিলেন চট্টগ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁহার পিতা জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দাদার চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে সামান্য বেতনে কাজ করিতেন। প্রীতিলতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা। বিদ্যালয়ে প্রীতিলতার কৃতী ছাত্রীরূপে বিশেষ খ্যাতি ছিল। মাতা-পিতাও তাঁহার উপর যথেষ্ট উচ্চাশা পোষণ করিতেন। এইজন্য তাঁহার বিদ্যাশিক্ষায় অর্থব্যয়ে তাঁহারা কৃপণতা করিতেন না। চট্টগ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রীতিলতা আই. এ. পড়িবার জন্য ঢাকায় আসিয়া ইডেন কলেজে ভর্ত্তি হন।

ঢাকাতেই প্রীতিলতার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। ঢাকাতে মেয়েদের অস্ত্রচালনা, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষার জন্য 'দীপালী সঙ্ঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রীতিলতা এই সমিতিতে যোগ দিয়া লাঠি ও ছোরা শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি ঢাকা ইডেন কলেজ হইতে বৃত্তিসহকারে আই. এ. পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন এবং বি. এ. পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে হয়। তিনি চট্টগ্রাম নন্দন হাইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী রূপে কর্ম্মগ্রহণ করেন। এখানে চাকরী করিতে করিতেই ১৯৩২ সালে তিনি নন-কলেজিয়েট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই সময়েই চট্টগ্রাম গুপ্ত-সমিতির নেতা সূর্য্য সেনের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। সূর্য্য সেন এই সময়ে গুপ্তভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রীতিলতাকেও ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া গুপ্ত জীবন যাপন করিতে হয়। ১৯৩২ সালের শেষ ভাগে এই ঘটনা ঘটে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঢাকায় অধ্যয়নের সময়েই গুপ্ত বিপ্লবীদলের সহিত প্রীতিলতার সংযোগ স্থাপিত হয়। চট্টগ্রামে আসিয়া তিনি বিপ্লবাত্মক কার্য্যে বিশেষ ভাবে জড়াইয়া পড়েন। প্রথমে মেয়েদের সহিত বিপ্লবী সংঘের সংশ্রব ছিল অন্য প্রকারের, তাঁহাদিগের উপর কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়া হইত না। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর হইতে বিপ্লবীদলের যাঁহারা নেতা তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন দূরে দূরে আত্মগোপন করিয়া। শহরের যুবক ভদ্রলোকদিগের উপর ছিল গোয়ান্দা বিভাগের ভয়ানক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সুতরাং সংবাদ আদান প্রদানের ভার

দিতে হয় মেয়েদের ও বালকদিগের উপর। এই ব্যাপারে তাঁহাদের যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রীতিলতা নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এবং অপূর্ব্ব সাহসিকতার পরিচয় দিয়া বিপ্লবীদলকে সাহায্য করিতেন। একবার দলের কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। টাকা সংগ্রহের জন্য দলের এক সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রীতিলতা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সকলের স্বীকৃতিতে সাড়ে চারি শত টাকা চাঁদা উঠিল, এখনও পঞ্চাশ টাকা উঠিতে বাকী। কিরূপে এই টাকা উঠিবে তাহা ভাবিয়া দলের নেতা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন প্রীতিলতা বলিলেন, "আমি উহা দিব।" অথচ প্রীতিলতার এমন অবস্থা নহে যে, তিনি ঐ টাকা দিতে পারেন। প্রথমতঃ দলের কেহই প্রীতিলতার এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। শেষে প্রীতিলতার একান্ত আকুল আগ্রহ দেখিয়া সম্মত না হইয়া পারিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্ব্বের দিন মাহিয়ানার টাকা আনিয়া প্রীতিলতার নিকট দিয়াছিলেন। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এবং খরচ চালাইবার ভার প্রীতিলতার উপর। তিনি বলিলেন, যে করিয়াই হউক তিনি সংসারের খরচ চালাইয়া লইবেন।

১৯৩২ সালের গোড়ার দিকে সূর্য্য সেনের প্রস্তাবে মেয়েদের লইয়া কার্য্যকরী বাহিনী গঠনের প্রস্তাব হয়। ইহাদিগকে শরীরচর্চ্চা এবং আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার ভার অর্পিত হয় তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর।

মাঝে মাঝে সূর্য্য সেনের গুপ্ত পল্লীভবনে সভার অনুষ্ঠান

হইত। এই সভায় প্রীতিলতাকেও যোগ দিতে হইত। একবার এই সভায় যোগদান করিতে যাইয়া তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যান।

সূর্য্য সেন তখন ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আহ্বানে প্রীতিলতা এই সময়ে সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী আসিয়া সেই বাড়ী ঘেরাও করে। ইহাতে তাঁহাদের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে গুলিগোলার বিনিময় হইতে থাকে। তখন প্রীতিলতাকেও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। পুলিস-বাহিনীর অধিনায়ক বিপ্লবিগণের গুলির আঘাতে সেই স্থানেই নিহত হয়। পুলিসের গুলিতে বিপ্লবীদলের মধ্যে নিহত হন অপূর্ব্ব সেন এবং নির্ম্মল সেন। নির্ম্মল সেন আহত হইয়া পড়িলে প্রীতিলতা তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু সূর্য্য সেন তাহাতে বাধা দেন এবং তাহাকে টানিয়া লইয়া অন্যত্র পলাইয়া যান। এই সময় হইতেই প্রীতিলতাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয়।

অবশেষে প্রীতিলতার উৎসাহে ও চেষ্টায় স্থির হইল, ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করিতে হইবে। কতকগুলি ইউরোপীয় নারী পুরুষকে হত্যা করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল না। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয়দের ক্লাব আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। সূর্য্য সেন অনেক

ভাবিয়া চিন্তিয়া এই আক্রমণে প্রীতিলতাকে সম্মতি দিয়াছিলেন। প্রীতিলতা প্রধানতঃ কিশোর কিশোরীদের লইয়া এই অভিযানের দলটি গঠন করিয়াছিলেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১০টা। পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাবে নাচগান ও নানাবিধ আমোদ চূড়ান্তভাবে আরম্ভ হইয়াছে। চট্টগ্রাম শহরের প্রায় অধিকাংশ ইংরেজ নারী পুরুষই এই ক্লাবে যাতায়াত করিত। এমন সময় বিপ্লবীদল ক্লাবঘরে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ চালাইল। এই দলে মাত্র আটজন লোক ছিল, সকলেই তরুণ কিশোর। এই অতর্কিত আক্রমণে ইউরোপীয়দল একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গুলিবর্ষণের ফলে একজন ইউরোপীয় মহিলা সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করে এবং আরও দশবার জন গুরুতর রূপে আহত হয়।

বিপ্লবীদলের গুলির শব্দ শুনিয়া নিকটে অবস্থিত সৈন্যদল ছুটিয়া আসে। বিপ্লবিগণ তখন পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়া পলায়ন করে।

প্রীতিলতা ছিলেন এই দলের নেত্রী। তাঁহার পরিধানে ছিল পুরুষের পোষাক। আক্রমণের সময় একটি বোমার খণ্ড তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হয় এবং রক্তপাতের ফলে তাঁহার জামা সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া যায়। ক্লাব ঘর হইতে পলায়ন করিয়া কিছুদূরে আসিয়াই প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়নাইডের গুঁড়া নিজের মুখে ঢালিয়া দেন ; ফলে সেখানে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রীতিলতার শরীরের আঘাত এমন গুরুতর হয় নাই, তিনি অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করিয়া আর বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক মনে করিয়াই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন।

বাংলার মেয়েদের কাছে প্রীতিলতা এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পর তাঁহার কাছে একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল,—বাংলার গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস রচনা করিতে বাংলার মেয়েরাও ছেলেদের পশ্চাৎবর্ত্তী নহে।

প্রীতিলতার পরেও বাংলার বহু মেয়ে এই বিপ্লবে ইন্ধন যোগাইয়া ইহাকে প্রাণবন্ত রাখিয়াছিলেন।

শহীদ সূর্য্য সেন



বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে সূর্য্য সেনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সরকারের দমন নীতি ও ধর পাকড়ের ফলে যখন বাংলার বিপ্লববাদ একেবারে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল, যখন বাংলার প্রায় সমস্ত নেতাই হয় কারারুদ্ধ, না হয় দ্বীপান্তরিত, অথবা অন্তরীণে স্থানান্তরিত, তখন সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে বাংলার পূর্ব্বপ্রান্তে চট্টগ্রামে বিপ্লবান্দোলন নূতন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছিল। এই সূর্য্য সেনের নেতৃত্বেই অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ব্রিটিশের সাম্রাজ্য নীতি তিরোহিত হইয়া তথায় বাঙ্গালীর স্বাধীনতার পতাকা স্থাপিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্রকায় বিরলকেশ প্রশস্তললাট ব্যক্তিটিকে কেন্দ্র করিয়া চট্টগ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে বিপ্লবচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা অতীব বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর।

সূর্য্য সেন জন্মিয়াছিলেন চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম রাজমণি সেন। বহরমপুর কলেজে

অধ্যয়নের সময়েই সূর্য্য সেন বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। পরে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং ছাত্রসমাজে ও যুবকদিগের মধ্যে বিপ্লবান্দোলন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিত্র মাধুর্য্য এবং বিপন্নের প্রতি দরদের জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সকলেরই ছিলেন 'মাষ্টার দা'। এই মাষ্টারদা'র কথায় ও আদেশে তখন যুবক ও বালকেরা সকলেই সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারিত। চট্টগ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার সম্মানে পূজা করিত।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরে সরকারের তীব্র দমননীতির ফলে বাংলার বিপ্লব আন্দোলন যখন সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত প্রায়, তখন চট্টগ্রামের কয়েকজন নেতার নেতৃত্বে তথায় বিপ্লবাগ্নি গোপনে গোপনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সরকারের দৃষ্টি প্রথমতঃ সে দিকে নিপতিত হয় নাই বলিয়াই চট্টগ্রামের নেতারা সে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় চেষ্টাতেই চট্টগ্রামে বিপ্লবপন্থী তরুণ নেতাদের সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সূর্য্য সেন ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা।

বিপ্লব আন্দোলন প্রচারের জন্য পুলিসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া এই সময় সূর্য্য সেনকে প্রায়ই কলিকাতায় যাতায়াত করিতে হইত। একবার সূর্য্য সেন যখন কলিকাতার শোভাবাজারে অবস্থান করিতেছিলেন তখন পুলিসের গুপ্তচরেরা তাঁহার সন্ধান পায়। বিপ্লবীদলের গুপ্তচরেরাও এই সংবাদ

পাইয়া ছিল, কিন্তু তাঁহারা সাবধান হওয়ার পূর্ব্বেই পুলিস আসিয়া তাঁহাদের আড্ডা ঘেরাও করে। সূর্য্য সেন এই সংবাদ পাইয়া তখনই পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কাঁধের উপর একখানা গামছা ফেলিয়া বাড়ীর চাকরের বেশে পুলিসের সম্মুখ দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। পুলিশ আর তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

বাংলাদেশের বিপ্লবীদল এই সময়ে দুইটি দলে বিভক্ত ছিল,—একটি যুগান্তরের দল, অপরটি অনুশীলন সমিতির দল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল যুগান্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সূর্য্য সেনের মধ্যে কোনও দলগত পার্থক্যের ভাব বর্ত্তমান ছিল না। তিনি ছিলেন সমুদয় দলগত ভাবের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে। সেই জন্য অনুশীলন দলের অনেক কর্ম্মীর সহিতও তাঁহার পরিচয় এবং ভাব ছিল। তাঁহারাও সূর্য্য সেনকে শ্রদ্ধা করিতেন।

১৯২৫ সালে চট্টগ্রামের যুবক সমিতিগুলির উপর পুলিসের দৃষ্টি পড়ে। এই সময়ে চট্টগ্রামে ও তাহার উপকণ্ঠে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ও অর্থ সংগ্রহের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বহু কর্ম্মীও বিনাবিচারে বন্দী হন। সূর্য্য সেনও এই সময় পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। তাহাকে প্রথমতঃ মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে, পরে রত্নগিরি জেলে আটক রাখা হয়। অবশেষে ১৯২৮ সালে সূর্য্য সেন প্রভৃতি নেতারা খালাস পাইয়া পুনরায় বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করেন।

চট্টগ্রামের বিপ্লব আন্দোলন এই সময় অতি মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। সূর্য্য সেন ফিরিয়া আসিয়া আবার এই

মরা গাঙ্গে বান ডাকাইলেন। সূর্য্য সেনের প্রথম কার্য্য হইল চট্টগ্রামের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরায় জীবন দান করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহ করা। এই সময়ে চট্টগ্রামে যুবক সমিতি এবং শরীর চর্চ্চার জন্য আখড়া গড়িয়া উঠে। এবং তরুণ যুবকেরা তাহাতে দলে দলে যোগদান করে। সূর্য্য সেন ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত আখড়ায় কেবল শরীর চর্চ্চা ও কুচকাওয়াজই হইত না। গোপনে গোপনে বাছাই বাছাই ছেলেদের বন্দুক ছোঁড়া, তরবারি চালনা, নৌকা চালনা, সন্তরণ এবং মোটর চালনাও শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত বোমা নির্ম্মাণও শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সময়ে সূর্য্য সেন ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক্। গুপ্তকার্য্য পরিচালনা করার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সকলের নেতৃস্থানে অভিষিক্ত। সকলেই তাহাদের এই নেতা মাষ্টারদা'র উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

জেলে বসিয়াই সুগভীর চিন্তার পর সূর্য্য সেন প্রাচীন বিপ্লব পন্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, এখানে সেখানে দুই একটা বোমা ফেলিয়া কিংবা দুই একটি সরকারী কর্ম্মচারী বা গুপ্তচর হত্যা করিয়া বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোনও উন্নতি হইবে না। বিপ্লবকে সার্থক ও জয়যুক্ত করিতে হইলে ইহাকে দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিতে হইবে, এজন্য চাই ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি। অন্ততঃ সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই বিপ্লবান্দোলন ছড়াইয়া দিতে না

পারিলেও দেশের কোনও বিশিষ্ট অংশে এই আন্দোলনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে কালে তাহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িতে পারিবে। এই ধারণা লইয়াই সূর্য্য সেন কাজ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু চট্টগ্রামের বাহিরের দলগুলি হইতে সূর্য্য সেন তেমন প্রাণবন্ত সাড়া পাইলেন না। কারণ দেশের প্রায় সমুদয় কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস-আইন-অমান্য আন্দোলনের দিকে। কিন্তু সূর্য্য সেন তাহাতে বিচলিত না হইয়া স্বীয় কর্ম্মপন্থাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থিত হয়। ইহাতে দেশব্যাপী এক অভাবনীয় উত্তেজনা ও উৎসাহের সাড়া পড়িয়া যায়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীসঙ্ঘও চূড়ান্ত সংগ্রামের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনানুযায়ী তাহাদের এক গোপন বৈঠকে স্থির হয় যে, এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখে রাত্রি দশটার পর এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার ইংরেজদের গুডফ্রাইডের পর্ব্ব। এই দিনটিতে বিদ্রোহ করিবার কারণ এই ছিল যে, আয়র্লণ্ডে আইরিশ গণতন্ত্র বাহিনী এই দিনটিতেই ইষ্টার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঐ দিনে সমুদয় ইংরেজ নরনারী তাহাদের ক্লাবে আনন্দ উৎসবে রত থাকিবে,

বন্দুক হইতে অনবরত গুলি বর্ষিত হইতে থাকে। এই অতর্কিত আক্রমণে অন্যান্য পাহারাওয়ালারা ভয়ে পলায়ন করে। গুলির শব্দে পাশের বাংলা হইতে সার্জ্জেণ্ট মেজর বন্দুক হস্তে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে, কিন্তু তাহাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে হয় নাই। একজন বিপ্লবীর গুলির আঘাতে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। সার্জ্জেণ্ট মেজরের স্ত্রী এই বিপদে অভিভূত হইয়া তাহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। বিপ্লবিগণ তাহাকে অভয় দিয়া গৃহাভ্যন্তরে পাঠাইয়া দেন।

ইহার পরই আরম্ভ হয় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। অস্ত্রাগারের দরজা খুলিয়া অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্রই গাড়ীতে বোঝাই করা হয় এবং পুরাতন গাদা বন্দুকগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অতঃপর বিপ্লবী-দল গাড়ী চালাইয়া পুলিশ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইয়া যান।

ঠিক এই সময়েই পুলিশ ব্যারাক এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জে একসঙ্গে আক্রমণ চালান হয়। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ঘরে ঢুকেই বোর্ডে কর্ম্মরত দেশীয় কর্ম্মচারীটিকে ক্লোরোফরমে অজ্ঞান করিয়া টেলিফোনের সুইস বোর্ড ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলা হয়।

পুলিশ ব্যারাকের আক্রমণ-কার্য্য শেষ হইতেও বেশী সময় লাগে নাই। এই অতর্কিত আক্রমণে প্রহরীরা এতই ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, তাহারা রীতিমত ভাবে প্রতিআক্রমণ চালাইতে সমর্থ হয় নাই। এই আক্রমণে পুলিশ ব্যারাকে ১১ জন নিহত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়।

কিছুক্ষণ পরেই দলের সমস্ত লোক একে একে আসিয়া পুলিশ ব্যারাকে সমবেত হয় এবং তথায় সূর্য্য সেনকে অধিনায়ক করিয়া বিপ্লবীদের প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিপ্লবীদলের উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতের স্বাধীনতার প্রথম পতাকা চট্টগ্রামের বক্ষে উড্ডীন করা। তাঁদের সে উদ্দেশ্য আপাততঃ সফল হইয়াছিল।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ পাইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অস্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। বিপ্লবিগণ তাঁহার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া নয় বার গুলি নিক্ষেপ করেন। ফলে গাড়ীর ভারতীয় চালক নিহত হয়, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের জীবন রক্ষা পায়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাড়াতাড়ি ষ্টীমার ঘাটে গিয়া কলিকাতার সৈন্যাবাসে বেতার সংবাদ প্রেরণ করেন এবং জেটীর অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিয়া পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে বিপ্লবীদের আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন।

পুলিশ ব্যারাকে বিপ্লবীদল আনন্দ উৎসবে মত্ত, এমন সময় পাহাড়ের উপরি পুলিশ-বাহিনীর কামান গর্জ্জন শুনা গেল। তখন বিপ্লবিগণ তাড়াতাড়ি একটি বৈঠকে স্থির করিলেন যে, শহরের উপকণ্ঠে একটা খাড়া পাহাড়ে যাইয়া তাঁহারা আশ্রয় লইবেন এবং সেখান হইতে আক্রমণের প্রতিরোধ করিবেন। তাহার পর নামিয়া আসিয়া চট্টগ্রাম শহরের উপর সরাসরি ভাবে আক্রমণ চালাইবেন।

ঐ সময় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করাই সুবিধা। এই জন্যই এই দিনটি ধার্য্য করা হইয়াছিল।

এই বিপ্লবাত্মক কার্য্য সমাধার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—

১। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ঘাঁটি দখল করিয়া তথাকার অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করা।

২। ভারতের সৈন্যবাহিনীর চট্টগ্রামে যে ঘাঁটি ছিল তাহা বিধ্বস্ত ও অধিকার করা। সেখানকার আধুনিক ধরণের অস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়া পুলিশ ঘাঁটিতে লইয়া আসা এবং অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিনষ্ট করিয়া ফেলা।

৩। চট্টগ্রামের সহিত কলিকাতা ও ঢাকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নষ্ট করিয়া ফেলা।

৪। চট্টগ্রামের সঙ্গে রেল ও টেলিগ্রাফের সংযোগ বন্ধ করিয়া বাহির হইতে সাহায্য আসা বন্ধ করা।

৫। সর্ব্বশেষে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করিয়া ইংরেজদের বন্দী করা।

প্রথম চারি দফা কাজ যাহাতে একসঙ্গেই হয় সেজন্য বিভিন্ন দলের উপর ভার দেওয়া হয় এবং এক এক দলের নেতৃত্ব ভার এক এক জন কর্ম্মীর উপর অর্পিত হয়। এক নম্বর কার্য্যের ভার নিলেন অনন্ত সিংহ এবং গণেশ ঘোষ। দুই নম্বর কার্য্যের ভার নিলেন লোকনাথ বল। তিন নম্বর কার্য্যের ভার অর্পিত হইল অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর উপর। চারি নম্বর কাজের জন্য কয়েক জন লোককে চট্টগ্রাম হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে ধূম নামক

একটা যায়গায় পাঠান হয়। ধূম এবং জোড়ারগঞ্জ ষ্টেশনের মধ্যস্থলে তাঁহারা ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ১০টার সময় রেল লাইন খুলিয়া রাখেন এবং টেলিগ্রাফের তারও কাটিয়া দেন।

ইহা ছাড়া আরও প্রায় ত্রিশজন লোককে পুলিশ ঘাঁটির আশেপাশে লুকাইয়া থাকিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তাঁহাদের উপর আদেশ থাকে যে, একটা বিশেষ সঙ্কেত পাইবামাত্র তাহারা যেন পুলিশ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হন।

দলের সকলেরই খাকী হাফসার্ট, শর্ট এবং কেড্স্ জুতা পরা ছিল। কেবল দলপতিদের গায়ে ছিল সামরিক অফিসর দিগের পোষাক। সাজসজ্জা শেষ করিয়া বিভিন্ন দলগুলি রাত্রি দশটার আগেই প্রস্তুত হয় এবং ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থানের দিকে যাত্রা করে।

রাত্রি ঠিক দশটা পনরো মিনিটের সময় মটর গাড়ী শহরের উপকণ্ঠে সৈন্যদের ছাউনীর সদর ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। বাইরের পাহারাওয়ালা গাড়ীখানার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আরোহীরা friend (বন্ধু) বলিয়া পরিচয় দেন। ছাউনীর সম্মুখে যে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল, গাড়ী-খানাকে সেখানে নিয়া দাঁড় করান হয়। গাড়ীর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসেন সামরিক অফিসারের পোষাক পরিহিত একব্যক্তি। সান্ত্রী তাঁহাকে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মনে করিয়া সামরিক কায়দায় তাঁহাকে সেলাম করিবার জন্য হাত তুলিলেই তাহার উপর গুলি বর্ষিত হয়। সেই গুলির আঘাতে সে ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। ইহার পর বিপ্লবীদের

বিপ্লবীদল পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে পেট্রল ঢালিয়া পুলিশ ব্যারাকটি পোড়াইয়া দিয়া গেল। সূর্য্য সেন তাঁহার ৫৭ জন সঙ্গী লইয়া গোপনে যাইয়া পাহাড়ে উঠিলেন। ইহাঁরা ঘন গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে এক পাহাড় হইতে অপর পাহাড়ে চলিতে লাগিলেন। একে প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ, তাহার উপর আবার সঙ্গে কিছুমাত্র আহার্য্য বা পানীয় নাই, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না। বিপ্লবীদলের তখন গোলাবারুদ বা অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না, অভাব ছিল কেবল লোকের।

দুই দিন পরে ২০শে এপ্রিল সকালে লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্মিথের অধিনায়কত্বে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ বাহিনীর একদল সৈন্য চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আশপাশের পাহাড়গুলিতে খোঁজ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঘটনার তিন দিন পরেও তাহারা বিপ্লবীদলের কোনও সন্ধান পায় নাই। ২১শে এপ্রিল সকাল বেলা সৈন্যবাহিনীর একদল জালালাবাদের পাহাড়ের উপর বিপ্লবীদলের সন্ধান পায়। বিকালবেলা পাঁচটার সময় তাহাদের পক্ষ হইতে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ হয়।

বিপ্লবীদল লক্ষ্য করিলেন, বিপক্ষদলের কয়েকজন লোক বুকে হাঁটিয়া রাইফেল সহ উপরে উঠিয়া আসিতেছে। সূর্য্য সেন তখন তাহাদের উপর গুলি নিক্ষেপের আদেশ দেন। বিপ্লবীদলের গুলি বৃষ্টির ফলে বিপক্ষদলের সমুদয় কৌশল ব্যর্থ হইয়া যায়।

অবশেষে রাত্রির অন্ধকারে বিপক্ষদল পার্শ্বের পাহাড় এবং

নীচ হইতে অবিরাম গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। রাত্রি প্রায় আট-টার সময় ইংরেজসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাতে হটিয়া যায়। বিপ্লবীদল তখন জালালাবাদ পাহাড়ের উপর বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তাঁহাদের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করেন। এই খণ্ডযুদ্ধে বিপ্লবীদলের দশজন নিহত হয়, আহতও হয় কয়েক জন। ইংরেজ পক্ষে নাকি হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শত, তন্মধ্যে নিহতের সংখ্যা ৬৪ জন।

সূর্য্য সেন বুঝিতে পারিলেন, প্রতিপক্ষ আপাততঃ হটিয়া গেলেও পরে তাহারা আবার ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করিবে, আর সে আক্রমণের প্রতিরোধ করা সহজসাধ্য হইবে না। তাই তিনি স্থির করিলেন, সম্মুখ আক্রমণ না করিয়া এবার গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং তথা হইতে সহসা আক্রমণ চালাইয়া শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। আহত কর্ম্মীদের তথায় ফেলিয়া রাখিয়া সূর্য্য সেন অবশিষ্ট সঙ্গীদের লইয়া গ্রামের পথে নামিয়া আসিলেন।

গ্রামের হিন্দু-মুসলমান এই সময়ে কখনও তাঁহাদের পরিচয় জানিয়া কখনও না জানিয়া এই বিপ্লবীদিগকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদের আহার্য্য ও পানীয় জোগাইয়া সাহায্য করিয়াছে।

মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপ্লবীরা নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আত্মগোপন করিয়া এই সময় নানা দিকে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ একটি দলকে ফেনী ষ্টেশনে পুলিশদল ঘেরাও করে। কিন্তু বিপ্লবীদল অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে গুলি চালাইয়া পলায়ন করে।

৬ই মে তারিখে কয়েকজন বিপ্লবী যুবক কর্ণফুলী নদী তীরস্থ ইংরেজ কর্ম্মীদের বাসভবন গুলি আক্রমণ করিবার জন্য চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র স্থানীয় গুণ্ডার দল তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশের আক্রমণ আসন্ন জানিয়া বিপ্লবীদলের ছয় জন একখানি নৌকাযোগে নদীর মধ্যস্থলে চলিয়া যায়। পোর্ট পুলিশ ষ্টীম লঞ্চ লইয়া তাঁহাদের পশ্চাতে তাড়া করে এবং উভয় দলে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। ইহাতে বিপ্লবীদলের চারিজন নিহত হয়, এবং দুইজন আহত হইয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

এই সময়ে চট্টগ্রাম শহরে পুলিশের অত্যাচার ভয়ানক ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। কাহারও নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিপ্লবীদলের কার্য্যকলাপ রীতিমত ভাবেই চলিতেছিল। সূর্য্য সেন তখন বাস করিতেন চট্টগ্রাম হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে একটি পল্লীগ্রামে। সেখান হইতেও তিনি তরুণ কর্ম্মীদের সহায়তায় শহরের সমুদয় সংবাদ লইতেন।

ঘটনার প্রায় দুই মাস পরে অনন্ত সিংহ কলিকাতায় পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। নিরীহ চট্টগ্রামবাসীদিগকে পুলিশের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্যই তাঁহার এই আত্মসমর্পণ। বিচারের জন্য তাঁহাকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সূর্য্য সেন যখন ধলঘাট নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন,

শিক্ষাবিদ সত্যপ্রিয় রায়



জন্মশতবর্ষ উদযাপন

১১ সেপ্টেম্বর '০৮
রবীন্দ্রসদন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬



সত্যপ্রিয় রায়
(১৯০৭-১৯৭৮)

শিক্ষা আন্দোলন ও গণ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, সর্বস্তরের নিপীড়িত মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু শিক্ষাবিদ সত্যপ্রিয় রায় ১৯০৭ সালের ১লা মার্চ অধুনা বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গিরীশ চন্দ্র রায় ছিলেন ব্যবহারজীবী। মাতার নাম স্বর্ণলতা রায়। ছাত্রজীবনে সত্যপ্রিয় রায় সফল খেলোয়াড় ও সমাজসেবী রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রবল ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। কৃতী ছাত্র সত্যপ্রিয় রায় মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম অনার্স ডিগ্রি লাভ করে স্নাতক হন। ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। বি টি পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯২৯ সালে নিজের জেলায় মৃত্যুঞ্জয় এইচ ই স্কুলে সহ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কিছুদিন ঐ স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করার পর জাফরগঞ্জ এইচ ই স্কুলে যোগদান করেন। তারপর যোগদান করেন কানুনগোপাড়া এইচ ই স্কুলে। ঐ সময় মাধ্যমিক শিক্ষকরা অতি স্বল্প বেতন পেতেন। তখন দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েই শিক্ষকতা করতে হতো। তবুও সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষকতা বৃত্তিই গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা তাঁর কাছে ছিল ব্রত। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী।

কলকাতায় এসে দক্ষিণ কলকাতার কালীধন ইনস্টিটিউটশনে ১৯৩৬ সালে শিক্ষকতা শুরু করেন। ৩০ বছর তিনি এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রদের খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক চর্চায় নজর, ছাত্রদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যে নিপুণ



...মানুষ, গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের অন্যতম পুরোধা।

১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে সত্যপ্রিয় রায়কে যুক্তফ্রন্ট শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন। শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়ের উদ্যোগে বহুকালের দুর্নীতিগ্রস্ত স্কুল বোর্ডকে বাতিল করা হলো, চাকরির নিরাপত্তার জন্যে ও গণতান্ত্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি গঠনের নতুন বিধি রচিত হল। পরিচালন সমিতিতে শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো হলো, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও ফিনান্স কমিটিতে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হলো, সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি বেতন কমিশনের বিবেচনাধীন হলো, সার্বিক প্রাথমিক আইনের খসড়া রচিত হলো, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। ফ্রন্টের শিক্ষা পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করেন তিনি, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন





সরকার 'পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা আইন' বাতিল করে 'পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আইন' (**West Bengal Board of Secondary Education Act**)-এর খসড়া বিধান পরিষদে আলোচনার জন্য পেশ করে। সত্যপ্রিয় রায় তখন বিধান পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। এই বিলের ওপর তিনি তিন দিন ধরে পূর্ণ সভাকক্ষে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। তাঁর বাগ্মীতায় মুগ্ধ অন্য সকল সদস্য তাঁদের জন্য নির্ধারিত সময় সত্যপ্রিয় রায়ের অনুকূলে ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেন।

১৯৬১ সালের অক্টোবরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক শিক্ষক সম্মেলনে অখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশন গঠিত হল। সত্যপ্রিয় রায় উক্ত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। দীর্ঘ সাত বছর তিনি এই পদে আসীন থেকে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেন।

১৯৬১ সাল থেকে বিশ্ব শিক্ষক সংঘ (**FISE**) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৬৩ সালে শিক্ষক মহাসম্মেলনে সত্যপ্রিয় রায় বিশ্ব শিক্ষক সংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধিত্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সংস্থার সঙ্গে সমিতির পরিচয় আরো প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এছাড়া ঐ সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। এছাড়া ১৯৫৭ সালে তিনি চীন দেশের শিক্ষক সংস্থার আমন্ত্রণে চীন দেশ পরিদর্শন করেন।

তিনি কোঠারি কমিশনের বিদ্যালয় সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমিক শিক্ষা উপবিভাগের সদস্য মনোনীত হন। এই উপবিভাগ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে যে সুপারিশ কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয় তা মূলত সত্যপ্রিয় রায়ের চিন্তার পূর্ণ প্রতিফলন। কমিশন পরবর্তীকালে সুস্পষ্টভাবে তার প্রতিবেদনে ১০+২ শিক্ষা কাঠামোর অনুকূলে সুপারিশ করেন। যা পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেন। সত্যপ্রিয় রায়



শিক্ষকের মর্যাদায় ভূষিত করে। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতেও প্রকাশ পেত। সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি একান্তভাবে মিশতেন।

শিক্ষক জীবনের শুরু থেকেই তিনি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। ক্রমশ স্কুল গঠনের সংগ্রামের সঙ্গে তিনি সমিতি গঠনের সংগ্রামকে একীভূত করে ফেললেন। সত্যের জন্য লড়াই ছিল সত্যপ্রিয় রায়ের জীবনাদর্শ।

১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে ভারত সভা ভবনে শিক্ষকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকরা শিক্ষা ও পেশাগত দাবির ভিত্তিতে একদিনের কর্মবিরতি করবেন। সকল বাধাবিপত্তিকে জয় করে পশ্চিমবাংলার শিক্ষক সমাজ সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে এই কর্মবিরতিকে সফল করে তুললেন।

তিনি ১৯৫০ সালে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি, ১৯৫২ সালে কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ বৎসরই বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে মাধ্যমিক শিক্ষকরা বিধানসভা অভিযান করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সত্যপ্রিয় রায় অনুভব করেছিলেন শিক্ষক সমাজ জাতির স্রষ্টা, অথচ তাঁদের জাতীয় মর্যাদা নেই। সমাজে অবহেলিত শিক্ষকদের নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। তিনি মনে করতেন শিক্ষা এবং শিক্ষক অভিন্ন। শিক্ষককে বাদ দিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ নির্মিত হতে পারে না। শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি। সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষার সম্প্রসারণ ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির জন্য ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবাংলায় বারো দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক আন্দোলনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে সত্যপ্রিয় রায় বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন। বিধান পরিষদ বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত একাধিকবার তিনি বিধান পরিষদে শিক্ষক আসনে



করেন।

তাঁরই উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, যা আজ সত্যপ্রিয় রায় কলেজ অফ এডুকেশন নামে পরিচিত।

মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিল করে ১৯৭৭ সালে সত্যপ্রিয় রায়কে প্রশাসক নিয়োগ করেন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এখানে তিনি মাত্র ৮ মাস কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৭৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

আদর্শ শিক্ষক, দক্ষ শিক্ষা-প্রশাসক, শিক্ষানীতি নির্দ্ধারক, শিক্ষা পরিকল্পনাকার সত্যপ্রিয় রায়ের আত্মত্যাগ ও নেতৃত্বদানের বিরল ক্ষমতা আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে।



পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পক্ষে অধ্যাপক স্বপন কুমার সরকার, সচিব, কর্তৃক প্রচারিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।